নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে জৈন যতিগণের চরণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে উদ্যান মধ্যে একটি পুরাতন পুকুর আছে। উহার নাম মধুগড়ে। কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে কাশীমবাজার নিবাসী জৈন মহাজনগণ নিজেদের ধনরত্ন বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া এই পুকুরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে উহার সমুদয়ের উদ্ধার সাধন আর হয় নাই, উহা নাকি "যখের ধনে" পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

কাশীমবাজারের **ব্যাসপুর** নামক স্থানে একটি সুন্দর মন্দির মধ্যে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতা রামকেশব শর্ম্মা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রাচীরের ইষ্টকে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহা এ অঞ্চলের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

কাশীমবাজার রাজবংশের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। কান্তবাবু বা কৃষ্ণকান্ত নন্দী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কাশীমবাজারে কান্তবাবুর একটি রেশমের দোকান ছিল। তিনি বাল্যকালে বাংলা, ফার্সী ও সামান্য ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকিবার সময় কোন ক্রমে পলাইয়া আসিয়া কাশীমবাজারে আশ্রয়ের সন্ধান করিতে থাকেন। নবাব সৈন্যের ভয়ে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহে না, তখন কান্তবাবু নিজ বিপদ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে নিজের দোকানে আশ্রয় দেন। নবাব সৈন্যগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া চলিয়া গেলে কান্তবাবু তাঁহার পলায়নের আয়োজন করিয়া দেন। কথিত আছে, গোপনতার জন্য কান্তবাবু ওয়ারেন্ হেস্টিংসের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতে পারেন নাই এবং পান্তাভাত ও চিংড়ি মাছ দিয়াই অতিথি সৎকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকালে হেষ্টিংস্ যখন ভাগ্য পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতের ভাগ্য বিধাতা হইলেন, তখন পূর্ব্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি কান্তবাবুকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং নিজে সহায় হইয়া তাঁহাকে বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন চেৎসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করেন সে সময়ে কান্তবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সৈন্যগণের অত্যাচার হইতে মহিলাদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি কাশীরাজমাতার নিকট হইতে বহু মূল্য নানারূপ অলঙ্কার পাইয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত রাজ প্রাসাদ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, একমুখ রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, রামচন্দ্রী মোহর প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। এ সমস্তই রেসিডেন্সী সমাধির অনতিদূরে কাশীমবাজার রাজ বাড়ীতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরাজিত চেৎসিংহের প্রাসাদ হইতে কান্তবাবু একটি পাথরের দালান উঠাইয়া আনিয়া কাশীমবাজারে নিজ বাটীতে স্থাপন করেন। কাশীমবাজার রাজ বাটীতে উহা এখনও দৃষ্ট হয়। কাশীমবাজার রাজবংশের রাজা কৃষ্ণনাথের পত্নী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী ও অশেষ গুণমণ্ডিত দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম বাংলাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কাশীমবাজারের পার্শ্বেই, বহরমপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **চুণাখালি** একটি পুরাতন স্থান। এখানে মসনদ আউলিয়া নামক এক ফকিরের সমাধি আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে চূণাখালি প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং এই স্থান একটি বাণিজ্য

কেন্দ্র হইয়া উঠে। পূর্ব্বে চূণাখালি একপ্রকার কাগজের জন্য বিখ্যাত ছিল। চূণাখালি হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে উহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মনোরম দেওদার বীথি নিশাত বাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। চূণাখালি এখন আমের জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে নানা জাতীয় আম জন্মিয়া থাকে যথা কাহিতুর, রাণীপদম্, শাদোল্লা, বোম্বাই, চিমৃনি, নাক্কি প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদ—কলিকাতা হইতে ১২২ মাইল দূর। শহরটি স্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। ইহা স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী।

মুর্শিদাবাদের পুরাতন নাম মুখসুদাবাদ বা মুখসুসাবাদ। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এখানে মুখসুদনদাস (মধুসূদনদাস) নামে এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের আখড়া ছিল; তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থসাহায্যে এই নগর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম হয় মুখসুদাবাদ। অন্যমতে মুখসুদন দাস একজন নানকপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন; তিনি গেড়ৌশ্বর হুসেন শাহের অসুখ সারাইয়া দিলে দরবার হইতে এই স্থানে বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ইহা নগরে পরিণত হয়। অপর একটি জনপ্রবাদ অনুসারে মখ্‌সুস্‌ আলি খাঁ নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী আধুনিক মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে কাশীম-বাজারের পার্শ্বস্থ চূণাখালিতে বাস করিতেন এবং তাঁহার নাম হইতেই চূণাখালির উত্তরাংশের নাম হয় মখসুসাবাদ বা মুখসুসাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে মুর্শিদাবাদের নাম নাই। "আকবরনামা" গ্রন্থে বাংলার এককালের শাসনকর্ত্তা সৈয়দখাঁর ভ্রাতা মুখসুস্‌ খাঁ নাকে এক ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন এই মুখসুসখাঁই যখন ফৌজদার বা নায়েব দেওয়ানরূপে চূণাখালিতে ছিলেন, তখনই উহার উত্তরাংশ মুখসুসাবাদ নাম প্রাপ্ত হয়। আজিও এঅঞ্চলের প্রাচীন লোকেরা মুর্শিদাবাদকে মুখসুদাবাদ বলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরেজী কাগজপত্রে ও আর্মি, হলওয়েল প্রভৃতি প্রথম ইংরেজ লেখকগণের বিবরণীতে মুখসুদাবাদ নামই আছে। মুখসুদাবাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে টাভার্নিয়ার এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং ইহাকে একটি প্রধান স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি ইহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন "মদেসু-বাজারকী" (Madesoubazarki)। লাহোর চিত্রশালায় রক্ষিত ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আওরঙ্গজেবের একটি টাকা হইতে জানা যায় যে সে সময়ে মখসুসাবাদে মুঘলদের একটি টাঁকশাল ছিল। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে শোভা সিং ও রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময় মুখসুদাবাদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীমবাজারের বণিকগণ বিদ্রোহীদের নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করায় তাঁহাদের শহর লুণ্ঠিত হয় নাই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায় ছিল। সে সময়ে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্‌শান বাংলার সুবাদার বা নবাব নাজিম ছিলেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত

হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। তৎকালে নবাব নাজিম ও দেওয়ান দুইটি পৃথক ও স্বাধীন পদ ছিল। অল্পদিনের মধ্যে আজিম উস্-শানের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অবশেষে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী সহ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মুখসুদাবাদে আসিয়া তাঁহার দপ্তর ও কর্ম্মস্থল স্থানান্তরিত করেন। তাহার সঙ্গে দর্পনারায়ণ কাননগো ও জগৎ শেঠদের পূর্ব্বপুরুষ মাণিকচাঁদও আসিয়া ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহ-বিচ্ছেদে যখন মুঘল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয় সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরুকশিয়ারের সময়ে বাংলার নবাবী পদও লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মুর্শিদাবাদ হয় এবং ইহাই বাংলার রাজধানী হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুর্শিদকুলী খাঁ সমগ্র বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন।

মুর্শিদকুলী খাঁ ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন। শৈশবে দারিদ্র্য নিবন্ধন তাঁহার পিতা তাঁহাকে জনৈক ইরাণদেশীয় বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। বণিক তাঁহাকে ইস্পাহানে লইয়া গিয়া পুত্রের ন্যায় লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁহার নাম হয় মহম্মদ হাদী। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন ও বেরারের দেওয়ানের অধীনে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কার্য্য কুশলতার জন্য দ্রুত পদোন্নতি হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে হায়দারাবাদের দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বাংলার দেওয়ানি পদলাভ এবং "কারতলব খাঁ" উপাধি লাভ করিয়া ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে গমনের কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই স্থানেই কর্ম্ম নৈপুণ্যের জন্য বাদশাহের নিকট হইতে "মুর্শিদকুলী মতিমন্ উল্ মুল্ক্ আলাউদ্দৌলা জাফরখাঁ নাসিরী নাসির জঙ্গ" এই উপাধি লাভ করেন এবং তদবধি মুর্শিদকুলীখাঁ নামেই পরিচিত হন।

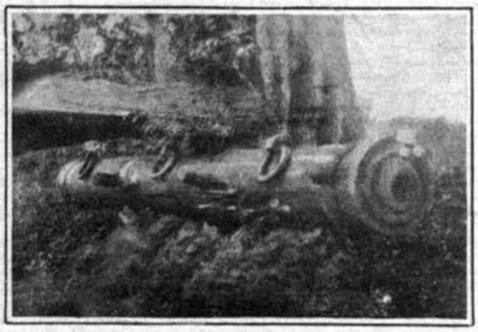
১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় তোড়রমল্ল "আসলজমা তুমার" নামক বাংলার রাজ্যের জমাবন্দোবস্তের কাগজ প্রস্তুত করেন। তাহার পর শাহ্ সুজা পুনরায় বাংলার রাজস্বের ব্যবস্থা করেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁ জমা বন্দোবস্তের আমূল সংস্কার করিয়া একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন; তিনি যে কাগজ প্রস্তুত করেন তাহার নাম "জমা কামেল তুমারী"। মুর্শিদকুলীখাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদের খাজনা কিছু চড়িয়া যাইলেও জমিদারগণ অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিতে পারিতেন না। এই বন্দোবস্ত নবাব মীর কাসিমের সময় পর্য্যন্ত প্রায় একভাবেই প্রচলিত ছিল। রাজস্ব বাড়াইবার জন্য তিনি অনেক জমিদারের প্রতি কঠোর ও নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। রাজস্ব বিভাগের সুবন্দোবস্ত ব্যতীত নবাব নাজিম হইয়া দেশ শাসনেরও নানারূপ উন্নতি সাধন করেন। চোর ডাকাত দমন করিবার জন্য মহম্মদ জান নামক তাঁহার এক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন; ইহার সাথে সাথে তীরন্দাজ ও কুঠারধারী লোক যাইত বলিয়া ইনি সাধারণ্যে 'কড়ালী' নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, মুর্শিদকুলী খাঁ কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান হইয়া জগন্নাথ পর্য্যন্ত পথে শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। চোর ডাকাতের উপদ্রব তিনি বহুলাংশে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিচার

প্রথারও সংস্কার করেন। তাঁহার সময়ে নিজামত, দেওয়ানী, কাজী ও ফৌজদারী এই চারি প্রকারের আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিজামত আদালতে তিনি কাজী মুফতী ও উলেমা গণের সাহায্যে স্বয়ং বিচার করিতেন। বিচারে তিনি কঠোর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কথিত আছে, ন্যায়ের অনুরোধে তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং হুগলীর কোতোয়াল একটি বালিকাকে অপহরণ করায় মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশে লোষ্ট্র নিক্ষেপে নিহত হন। মুর্শিদকুলী খাঁর এক জন মাত্র পত্নী ছিলেন। তাঁহার নাম নসেরুবানু বেগম। মুর্শিদকুলী খাঁ বিলাসিতা সহ্য করিতে পারিতেন না; আহারাদিতেও তিনি সংযমী ছিলেন বলিয়া কথিত। কেবল বরফ ব্যবহার করিতেন বলিয়া রাজমহল পাহাড়ে বরফ জমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ধাৰ্ম্মিক ও বিদ্বান্ ছিলেন। কথিত আছে, বহু ফকীর ও দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে আহার পাইত এবং পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিকেও আহার দিতেন। দুর্ভিক্ষ যাহাতে না হয় সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত থাকিতেন। ইউরোপীয় বণিক্‌গণ যাহাতে আহারের প্রয়োজনের বেশী শস্যাদি জাহাজে উঠাইতে না পারেন সেজন্য হুগলীর ফৌজদারের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল। সরকারী কাগজপত্রে তিনি লাল কালীতে সহি করিতেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদকে রাজধানীর উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নিজামত কেল্লা নামক স্থানে কেল্লা, প্রাসাদ, দরবারগৃহ প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার দরবারগৃহ বা "চেহেল সেতুন" চল্লিশটি স্তম্ভ সংযুক্ত ছিল; ইহাদের কোনও চিহ্ন মাত্র নাই। বর্ত্তমান সুবৃহৎ মণিবেগমের মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানেই চেহেলসেতুন বিরাজ করিত। কাট্‌রার বিরাট্ মস্‌জিদটি শুধু এখনও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। যদিও ভূমিকম্পে মসজিদটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি উহা মুর্শিদাবাদের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। শহরের পূর্ব্বদিকে লালবাজার নামক মহল্লায় ইহা অবস্থিত; লাল বা পশ্চিম দেশীয় নবাব সরকারের কর্ম্মচারিগণ এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম হয় লালবাজার। ১১৩৭ হিজরায় (১৭২৩ খৃষ্টাব্দে) মুর্শিদকুলীখাঁ মক্কাশরীফের সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার চারিপাশে একটি বাজার বসাইয়া ছিলেন। কাট্‌রা বা বাজারের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম কাট্‌রা মসজিদ। সোপান শ্রেণী পার হইয়া পূর্ব্বমুখী তোরণ দ্বারের উপর দ্বিতল নহবৎখানা, তাহার পরেই একটি প্রকাণ্ড সমচতুস্কোণ অঙ্গন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৬৫ ফুটেরও অধিক। ইহার পরই ভগ্নোন্মুখ পাঁচটি গম্বুজ বিশিষ্ট বিরাট্ মসজিদ। ছোট ছোট বাংলা ইটে এই বিশাল গম্বুজগুলির খিলান কিরূপে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চারিকোণের চারিটি মিনারের দুইটি মাত্র এখনও অবশিষ্ট; দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারে উঠিতে পারা যায় এবং তথা হইতে মুর্শিদাবাদের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। মস্‌জিদ অঙ্গনের তিন দিকে দ্বিতল বাটীতে নীচের তলায় দোকান ছিল এবং উপরের তলায় কোরাণ পাঠকদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কথিত আছে, এই মস্‌জিদে ৭০০ কারী বা কোরাণ পাঠক থাকিতেন। মসজিদ নির্ম্মাণের দুই বৎসর পরে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ইচ্ছা ও ব্যবস্থা অনুসারে মস্‌জিদের সোপান শ্রেণীর নীচে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন এই স্থানে সমাহিত হইয়া ভক্ত উপাসক মণ্ডলীর

পদধূলি তিনি বক্ষে ধারণ করিতে চাহেন। মস্‌জিদের দ্বারে একখণ্ড কষ্টি পাথরে ইরাণীয় ভাষায় লিখিত আছে "স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয় লোকের যিনি গৌরব, আরবের মহম্মদের জয় হউক। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাহার মস্তকে ধূলি বর্ষিত হউক।" মানসিক করিয়া বহু লোকে এই সমাধির উপর মালার অর্ঘ্য দিয়া থাকেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শিল্পী হজেস্ এই মসজিদ দেখিয়াছিলেন এবং ইহার একটি রঙীন চিত্র তাঁহার Select Views in India গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কাটরা মস্‌জিদের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গোবরানালার উপর শহর রক্ষার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ একটি তোপখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহল্লাটি এখনও তোপখানা নামে পরিচিত। অতীতের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী নামে একটি প্রকাণ্ড



জাহান্‌কোষা কামান

কামান পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং পরিধিতে ৪৷৷০ ফুট। বহুকাল জমিতে পড়িয়া থাকার সময় নীচ হইতে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়া দুইটি গুঁড়ির সাহায্যে কামানটিকে ভূমি হইতে প্রায় ১৮ ইঞ্চি উপরে উঠাইয়াছে। কামানের গায়ে ইরাণীয় ভাষায় লিখিত নয় খণ্ড পিতলের ফলক আছে। এই ফলক হইতে জানা যায় যে সাজাহানের রাজত্বকালে ইস্‌লাম খাঁ যখন বাংলার সুবাদার, তখন জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা শের মহম্মদ ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের পর্য্যবেক্ষণে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দন ১০৪৭ হিজরা জমাদিয়স্ সানি মাসে (অক্টোবর ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে) এই কামান নির্ম্মাণ করেন। ইহার ওজন ২১২ মণ এবং ইহাতে ২৮ সের বারুদ লাগে বলিয়া লিখিত আছে। সাধারণ লোকে কামানটিকে সিঁদূর লিপ্ত করিয়া পুষ্প, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা করিয়া থাকে।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ বা সুজাউদ্দৌলা বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদারী প্রাপ্ত হন। তিনি শাসন কার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য একটি মন্ত্রণা সভা গঠিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং দেওয়ানী কার্য্যে অভিজ্ঞ রায় আলমচাঁদ ছিলেন। তখনকার যুগে ইহা অভিনব ব্যবস্থা বলিতে হইবে। আলিবর্দ্দী খাঁ পরে বিহারের শাসক বা নায়েব নাজিম পদে প্রেরিত হন। রাজস্ব ব্যাপারে অভিজ্ঞতার

জন্য আলমচাঁদকে সুঁজা খাঁ বাদশাহের নিকট হইতে "রায়রায়ান" উপাধি আনাইয়া তাঁহাকে ভূষিত করেন। দেওয়ানী কার্য্য ক্রমশঃ রায়রায়ানদিগের হস্তে আসিয়া পড়ে এবং আলমচাঁদই প্রথম নায়েব দেওয়ান হইতে প্রধান দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। এইরূপে রাজস্ব মন্ত্রীর সমস্ত কার্য্য রায়রায়ানগণ করিতে থাকেন। কাননগোগণের কার্য্য ছিল রাজস্ব বিষয়ক কাগজ পত্র রক্ষা করা। রায়রায়ান পদ বহু দিন প্রচলিত ছিল এবং ইংরেজী আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ইহার লোপ হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে যে সকল জমিদার বন্দী হইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের মুক্তি দিয়া, তাঁহাদের করভার হ্রাস করিয়া উদারতা ও ন্যায়পরতার সহিত শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দের প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন এবং মুক্ত-হস্তে দান করিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে নিম্মিত প্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতি তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তাহাদের ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া সুন্দর সুন্দর ও সুসজ্জিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নিম্মিত ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার মুর্শিদাবাদে এখনও একটি দ্রষ্টব্য, এত উচ্চ তোরণদ্বার বাংলাদেশে খুব কমই আছে।

মুর্শিদাবাদের অপর পারে **ডাহাপাড়া** গ্রামে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সুজা খাঁ ফর্হাবাগ (বা সুখ কানন) নামে একটি অতি মনোরম ও সুসজ্জিত উদ্যান ও প্রমোদ বাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রিয়াজ-উস্ সলাতিনে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহা কাশ্মীরের উদ্যানগুলি হইতেও রমণীয় ছিল এবং সুরলোকের উদ্যানও ইহার নিকট ম্লান মনে হইত, স্বর্গের পরীরা ফর্হাবাগের শোভায় মুগ্ধ হইয়া তথায় আসিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিত; আরও লিখিত হইয়াছে, পরীদের কথা শুনিয়া ভীত হইয়া সুজা খাঁ ধূলিবৃষ্টি দ্বারা উদ্যানের সৌন্দর্য্য ম্লান করিয়া তাহাদের আগমন বন্ধ করেন। শেষের দিকে নবাব সুজাউদ্দীন শাসন কার্য্য একরূপ মন্ত্রণা পরিষদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং নিজে ফর্হাবাগে প্রমোদ বিলাসে সময় কাটাইতেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে ফর্হাবাগের কিছু দক্ষিণে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। যে স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয় উহা এখন রোশনিবাগ নামে পরিচিত। রোশনিবাগ এখনও একটি ছায়াশীতল মনোরম উদ্যান। সুজা খাঁর সমাধিটি দৈর্ঘ্যে ১০॥ ফুট; এত বড় সমাধি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সুজা খাঁর প্রিয় ফর্হাবাগ আজ প্রায় চিনিতে পারা যায় না; দু একটি ভগ্নাবশেষ ও নামটি এখন বর্ত্তমান। এই ডাহাপাড়া গ্রামে মুর্শিদকুলীর সহিত আগত প্রধান কাননগো দর্পনারায়ণ প্রকাণ্ড বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। প্রধান কাননগোগণ তখন "বঙ্গাধিকারী" নামে অভিহিত হইতেন এবং উত্তরাধিকারক্রমে এই পদ পাইতেন। কথিত আছে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রায় রাজা তোড়রমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় প্রধান কাননগো পদে উন্নীত হন এবং কার্য্য কুশলতার জন্য সম্রাট আকবরের নিকট হইতে বঙ্গাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হন; তদবধি এই উপাধি চলিয়া আসে। তৎকালে জমিদারগণ বঙ্গাধিকারীদিগকে যথেষ্ট ভয় করিতেন এবং সম্মানে তাঁহারা নবাব ও জগৎশেঠদের পরেই ছিলেন। ডাহাপাড়া হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে কিরীটকণা গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন তীর্থ স্থান ও উপপীঠ কিরীটেশ্বরী অবস্থিত। পূর্ব্বভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "লালবাগ কোর্ট রোড" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

সুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ মাত্র এক বৎসরের জন্য নবাব হইয়াছিলেন; কথিত আছে, যে তিনি শত্রু কর্তৃক প্রাণ নাশের এত ভয় করিতেন যে পিতার সমাধির সময়ও দুর্গ ছাড়িয়া যান নাই। শাসনকার্য্য তিনি বিশেষ কিছুই দেখিতেন না এবং পিতার আমলের মন্ত্রণা-সভার উপরই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, মন্ত্রণা-সভার রায়রায়ান আলমচাঁদ, হাজী আহম্মদ ও জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সরফ্‌রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টিত হন। অবশেষে আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল উত্তরে গিরিয়ার যুদ্ধে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সরফ্‌রাজ খাঁ নিহত হন। পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "জঙ্গীপুর" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

সরফ্‌রাজের মাহুত তাঁহার মৃতদেহ লইয়া কোনওরূপে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসে এবং রাত্রিকালে গোপনে তাঁহাকে নেক্‌টাখালির প্রাসাদে সমাহিত করা হয়। মুর্শিদাবাদ স্টেশন হইতে লালবাগে যাইবার পথে এই সমাধি দৃষ্ট হয়, ইহা এক্ষণে সরকারী "রক্ষিত কীর্ত্তি" বিভাগের রক্ষণাধীন। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের মধ্যে এক মাত্র সরফ্‌রাজ খাঁই রণক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন। ইহার পরই আলিবর্দ্দী খাঁ মসনদে আরোহণ করেন এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট বহু মূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া বাংলা দেশের ও ওড়িষ্যার নবাবী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল এবং আলিবর্দ্দী ১৬ বৎসর স্বাধীনভাবেই মুর্শিদাবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দিল্লীতে কখনও রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই।

১৭৪১ হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়েই আলিবর্দ্দী খাঁকে ওড়িষ্যা ও বিহারের বিদ্রোহ দমন করিতে এবং মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে কাটাইতে হইয়াছে। বাংলা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং একবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধের জন্য বাংলার জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে দেড় কোটি টাকা দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ঢাকার শাসনকর্ত্তা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর উপর মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত। আলিবর্দ্দী খাঁ বর্গী বা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বারংবার আক্রমণ ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১৭৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে যখন নবাব কাটোয়ার নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাধাদানে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে একদল মহারাষ্ট্রীয় মীর হাবীবের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ নগরী লুণ্ঠিত করিয়া জগৎশেঠদিগের নিকট হইতে দুই ক্রোড় টাকা লইয়া যায়। নবাব আলিবর্দ্দী তাড়াতাড়ি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে বারংবার যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া ওড়িষ্যা প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ছাড়িয়া দিয়া এবং বাংলার চৌথ হিসাবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার পর পাঁচ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি সমভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং নানা বিপদের মাঝেও শান্তিতে রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার বিশেষ বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই। একবার ইংরেজদের একটি

রণতরী হুগলীর বণিকদিগের জাহাজ আটক করিলে আলিবর্দ্দী খাঁ কাশিমবাজারের কুঠি অবরোধ করেন এবং ইংরেজরা নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা খেসারৎ দিতে বাধ্য হন।

আলিবর্দ্দী খাঁর একমাত্র পত্নী আদর্শ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কথিত আছে, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যাপারে নবাব তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সময় আলিবর্দ্দী খাঁর পার্শ্বে নবাব-বেগমও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং অপরিসীম সাহসের সহিত রণক্ষেত্রের বিপদ ও রণের সম্মুখীন হইয়া স্বামীকে উৎসাহ দান করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা ১৮ বৎসর বয়সে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর পত্নী এবং সিরাজের বড় মাসীমা ও জ্যেঠাইমা ঘসেটী বেগম বরাবর তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন এবং তিনি যাহাতে সিংহাসন না পান তার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। সেই জন্য সিরাজ মসনদ পাইয়া ঘসেটী বেগমের মতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং কথিত আছে নওয়াজেস্ মহম্মদ কর্ত্তৃক সঞ্চিত প্রায় ৬১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধন দৌলত কাড়িয়া লন। ইহার অল্প পরেই ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয় এবং তিনি তাঁহাদিগকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সঙ্কল্প করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি কাশীমবাজারের ইংরেজদের কুঠি দখল করেন এবং এইরূপে দুপক্ষে সংগ্রাম সুরু হইয়া যায় এবং সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা দখল করেন। ইহার পর ক্লাইভ কলিকাতা পুনর্গ্রহণ করেন এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরাজের সহিত ক্লাইভের সন্ধি হয়। (দমদম্ ক্যান্টনমেণ্ট দ্রষ্টব্য।) এই বৎসরই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তাঁহার স্থানে বসাইতে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ ত্রবং ক্লাইভের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়। ইহা স্মরণীয় যে মীরজাফর আলিবর্দ্দী খাঁর সংসারে থাকিয়া মানুষ হন এবং সদ্বংশজাত বলিয়া আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত বৈমাত্রেয় ভগিনী শাখানমের বিবাহ দেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজ-উদ্-দৌলা ক্লাইভের হস্তে পরাজিত হন। (পলাশী দ্রষ্টব্য।) সিরাজ-উদ্-দৌলা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আসিয়া পরদিন ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রে কিছু পরিমাণ অর্থ, অলঙ্কার ও পত্নী লুৎফউন্নিসা ও চারি বৎসরের শিশুকন্যা ওম্মৎজাহুরাকে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভগবানগোলা হইতে নৌকাযোগে রাজমহলের দিকে যাত্রা করিলেন। ইতি মধ্যে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং যুদ্ধের ছয় দিন পরে ২৯শে জুন ক্লাইভ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে সিরাজ-উদ্-দৌলার শূন্য মসনদে বসাইলেন। এ দিকে সিরাজ-উদ্-দৌলা তিন দিন তিন রাত অনাহারে কাটাইয়া নৌকাযোগে রাজহলের দিকে পৌঁছিলেন; এই সময়ে তিনি কিছু খিচুড়ী খাইতে চাহেন এবং একজন সামান্য ফকির খিচুড়ী রাঁধিয়া দিতে রাজী হয়। এই ফকির তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গোপনে মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিম ও ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলে তাঁহারা সিরাজকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে মীরজাফরের নবাব হইবার পূর্ব্বেকার বাসস্থান জাফরাগঞ্জের বাটীতে বন্দী করিয়া রাখা হয়। জাফরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদের নিজামত কেল্লার এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই জাফরাগঞ্জের বাটীতে

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মীরজাফরের সহিত কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল ওয়াট্‌সের গুপ্ত সন্ধি হয়। এই মন্ত্রণায় দুর্লভরাম, জগৎশেঠ প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। কথিত আছে ওয়াট্‌স্ সাহেব গোপনতার জন্য পাল্কি করিয়া পর্দ্দানশীন রমণী সাজিয়া মন্ত্রণায় যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরণের প্ররোচনায় মহম্মদীবেগ নামক এক ব্যক্তির হস্তে জাফরাগঞ্জের বাটীতে হতভাগ্য কারারুদ্ধ সিরাজ মাত্র ২০ বৎসর বয়সে নৃশংসভাবে নিহত হন। কথিত আছে, মীরণের অনুচরবর্গ সিরাজকে হত্যা করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেহই সম্মত হন নাই। অবশেষে আলিবর্দ্দী এবং তাঁহার বেগমের অন্নে ও যত্নে পালিত কৃতঘ্ন মহম্মদী বেগ এই কার্য্যে অগ্রসর হয়। সৈয়র-মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সিরাজ একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাজ্যের এক প্রান্তে সামান্যভাবেও কি তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে দেওয়া যায় না। পর মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠেন, "না, তাহারা তা দিবে না" এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘাতকের তরবারির আঘাতে খণ্ডিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হন। যে গৃহে সিরাজকে নিহত করা হইয়াছিল তাহা এখন পড়িয়া গিয়াছে এবং স্থানটিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদবাসিগণ এই স্থানটিকে এখনও "নিমকহারামী দেউড়ী" বলিয়া থাকেন। জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে মীরণের বংশধরগণ এখনও বাস করেন। জাফরাগঞ্জ নাম মীরজাফরের নাম হইতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদকুলী খাঁর অপর নাম জাফর খাঁ হইতে হইয়াছে। এই জাফরাগঞ্জেই আবার মীরজাফর এবং তাঁহার দুই পত্নী মণি বেগম ও বচু বেগম হইতে তদ্বংশীয় নবাব-নাজিম-দিগের সমাধিভবন, ইহা পশ্চিম মুখে রাজপথের উপরে অবস্থিত এবং সমাধিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা মুর্শিদাবাদের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতিদিন একশত কারী বা কোরাণ পাঠক এই স্থানে আসিয়া মৃতদিগের উদ্দেশ্যে কোরাণ পাঠ করেন।

সিরাজের হত্যার পর তাঁহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহার মাতার বাটীর সম্মুখ দিয়া সারা মুর্শিদাবাদ শহরে ঘুরাইয়া খোশ্‌বাগে মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর সমাধির নিকট সমাহিত করা হয়। খোশ্‌বাগ—মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহল্লার কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর অপর বা পশ্চিমকূলে অবস্থিত। নদীকূলে উদ্যান মধ্যে অবস্থিত এই সমাধি ভবনটি এখানকার অপর একটি দ্রষ্টব্য। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার মাতাকে সমাহিত করিবার জন্য এই মনোরম উদ্যানটি নির্ম্মাণ করেন এবং তিনি নিজেও মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাশিত ইচ্ছানুসারে এই স্থানে সমাহিত হন। আলিবর্দ্দীর দক্ষিণে তাঁহার পত্নীর এবং সিরাজের পাদদেশে তৎপত্নী লুৎফউন্নেসার সমাধি। সিরাজের পূর্ব্বপার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জা মেহেদীর সমাধি; কথিত আছে মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলে পঞ্চদশ বর্ষীয় মির্জ্জা মেহেদী প্রথমে কারারুদ্ধ হন এবং পাছে মুক্ত হইয়া মসনদের দাবীদার হন সেই আশঙ্কায় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য মীরজাফর পুত্র মীরণকে আদেশ দান করেন, সৈয়র মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে দুই খানি তক্তার মধ্যে বালককে দড়ি দিয়া কষিয়া বাঁধিয়া হত্যা করা হয়। এই সমাধিগৃহটির মধ্যে আরও দুইটি কবর

আছে। ইহা ছাড়া খোশ্‌বাগে আরও সমাধি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে ইহার একটি সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে; ইহার চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত এবং ইহা দুইটি প্রাঙ্গনে বিভক্ত।

সিরাজের হত্যার পর আলিবর্দ্দী খাঁর বেগম ও কন্যা ঘসেটী ও আমিনা বেগম ও সিরাজ মহিষী লুৎফউন্নেসা ও শিশু কন্যা উম্মৎ জাহুরা নানা রূপ লাঞ্ছিত ও কারাগারে বন্দী থাকিবার পর ঢাকায় নির্ব্বাসিত হন। কথিত আছে, সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফ-উন্নেসাকে পুনরায় বিবাহের কথা বলিলে তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন যে যে হস্তিপৃষ্ঠে চলিতে অভ্যস্ত, সে কি কখনও গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ করে? কিছু কাল ঢাকায় থাকিবার পর ইংরেজদের চেষ্টায় লুৎফউন্নেসা মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধির তত্ত্বাবধানের ভার পান। তিনি নিজের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তি এবং সমাধির জন্য মাসিক ৩০৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার জীবিত কালেই কন্যা উম্মৎ জাহুরার মৃত্যু হয়। সুতরাং লুৎফউন্নেসার পর তাঁহার চার দৌহিত্রী সমাধি তত্ত্বাবধানের ভার পান। এখন ইহা সরকারের হাতে।

মীরজাফর সিংহাসনে উঠিয়া নানাদিক্ দিয়া অর্থাভাব বোধ করেন এবং দেওয়ান রায়দুর্লভ ও শেঠদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর মীরজাফর ইংরেজদিগের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান। ইংরেজেরা অতঃপর তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে মসনদে স্থাপন করেন। মীরকাসিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে লইয়া গিয়া তাঁহার সেনাবাহিনী ইউরোপীয় আদর্শে সুগঠিত করেন এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত যোগ দিয়া প্রথম হইতেই ইংরেজদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া ইংরেজ কোম্পানির সহিত তাঁহার বিবাদ সুরু হয়; কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্ম্মচারীরা বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিবার দাবী করেন, ইহার উত্তরে নবাব দেশী বিদেশী সকল ব্যবসায়ীকেই শুল্ক মকুফ আদেশ দান করেন। কোনও মিটমাট না হওয়ায় যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইংরেজদের পাটনাস্থ কুঠির জন্য প্রেরিত অস্ত্র শস্ত্র বোঝাই কয়েক খানি নৌকা গঙ্গাপথে মুঙ্গের দিয়া যাইবার সময় নবাব কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। নবাব পক্ষীয় সেনা কর্ত্তৃক কাশিম-বাজার কুঠিও অধিকৃত হয়। ইহার পর ইংরেজ পক্ষ মুর্শিদাবাদ অধিকার করে। কিন্তু উভয় পক্ষে সত্যকার যুদ্ধ মুর্শিদাবাদ হইতে ২০ মাইল উত্তরে সূতীর নিকট গিরিয়ার প্রান্তরে বাঁশলই ও ভাগীরথীর মোহানার নিকট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অগস্ট মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে নবাব-সৈন্য পরাজিত হয়। ইহা গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ বা সূতীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার জঙ্গীপুর রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য)। গিরিয়ায় পরাজিত হইয়া নবাব সৈন্য রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে উধুয়া নালায় শিবির স্থাপন করে। ১১ই অগস্ট ইংরেজ সৈন্য উধুয়ানালার ৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ফুদকিপুর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। উধুয়া নালার সুন্দর অবস্থান হেতু ইংরেজ সৈন্য প্রথমে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই; অবশেষে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিশেষে ইংরেজ বাহিনী কৌশলে এবং অতর্কিতে নবাব পক্ষীয়

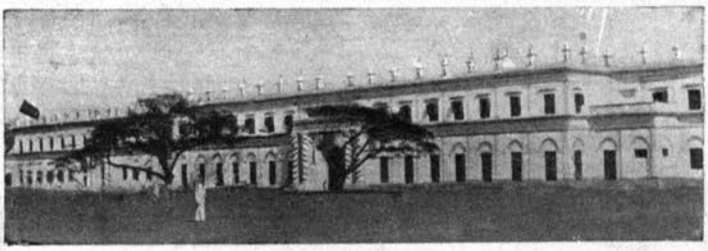
শিবির আক্রমণ করিয়া ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে উহা অধিকার করিয়া লয়। নবাব পক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মীরকাসিম মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজ্য ফিরিয়া পাইবার আশা নির্ম্মূল হইলে রোহিলখণ্ড অঞ্চলে পলায়ন করেন। দারিদ্র্যে এবং প্রায় অজ্ঞাতভাবে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি দুইখানি শাল বিক্রয় করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মীরকাসিমকে সিংহাসন চ্যুত করিবার মনঃস্থ করিলে পুনরায় মীরজাফরকেই ইংরেজগণ বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য স্থির করেন। মীরজাফর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুনরায় মুর্শিদাবাদে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জীবিত পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নজম উদ্দৌলা ২০ বৎসর বয়সে মসনদ প্রাপ্ত হন্। মীরজাফরের জীবিত কালেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মৃত্যু হয়। কথিত আছে তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। আরও কথিত হয় যে সিরাজ উদ্দৌলার মাতা আমীনা এবং মাসীমা ঘসেটী বেগমকে মীরণ ঢাকায় নৌকা ডুবাইয়া-হত্যা করেন। মরিবার সময় তাঁহারা অভিশাপ দেন, যেন তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। নজমউদ্দৌলার সময়ে লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ হইতে কার্য্যতঃ বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। নবাবের প্রাসাদের খরচ ও বিচার কার্য্যের ভারের জন্য বার্ষিক ৫৩, ৮৬, ১৩১, সিক্কা টাকা বরাদ্দ হয়। পর বৎসর লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে দরবার করিয়া নবাবের পার্শ্বে দেওয়ান রূপে বসিয়া প্রথম পুণ্যাহ করেন। ইহার অল্প পরেই ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নজমউদ্দৌলা হঠাৎ মারা যান এবং তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলা নবাব নাজিম হন। ইহার নিজামতী বৃত্তি কমাইয়া বার্ষিক ৪১,৮৬, ১৩১ সিক্কা টাকায় নির্দ্ধারিত হয়। পরবর্ত্তী নবাব মুবারক উদ্দৌলার সময় উহা কমাইয়া ১৬ লক্ষ টাকা করা হয় এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা ঐরূপই থাকে। মুবারক উদ্দৌলার সময়ে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বিচার কার্য্যও নবাব নাজিমের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। তদবধি মুর্শিদাবাদ আর রাজধানী রহিল না এবং নবাবেরও আর রাজকীয় কোন ক্ষমতাই থাকিল না। মুবারক উদ্দৌলার পর বাবরজঙ্গ, আলিজা, ওয়ালাজা, হুমায়ুনজা ও ফেরিদুনজা বা মনসুর আলি নবাব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হন। শেষোক্তই মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব নাজিম এবং তাহার সময়ে নবাব নাজিমদিগের অবশিষ্ট অধিকার খর্ব্ব করা হইলে ফেরিদুনজা বিলাতে গিয়া হাউস অব কমন্সে অভিযোগ করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নবাব নাজিম উপাধি পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে তাঁহার বংশীয়েরা বংশানুক্রমে মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন।

মুর্শিদাবাদের দ্রষ্টব্য গুলির মধ্যে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত **জাফরাগঞ্জ** এবং মধ্যভাগে অবস্থিত **কাট্‌রা মস্‌জিদ, তোপখানা, জাহানকোষা কামান,** নবাব সুজাউদ্দীনের **ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার** এবং নবাব **সরফরাজ খাঁর সমাধির** কথা উপরে বলা হইয়াছে। কাট্‌রা মসজিদের দক্ষিণে অনতিদূরে কদম শরীফ বা কদম রসুল নামে একটি

মসজিদ আছে। উহার মধ্যে গৌড় হইতে আনীত ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের পদচিহ্ন-ধারী বলিয়া কথিত একটি প্রস্তরখণ্ড কিছুকাল রক্ষিত ছিল; পরে উহা গৌড়ে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়া ছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শহরের মধ্যভাগেই লালবাগ মহল্লা; তথায় লালবাগ মহকুমার আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। লালবাগের ঠিক উত্তরেই ভাগীরথী তীরে **নিজামত কেল্লার** মধ্যে মুর্শিদাবাদের **হাজারদুয়ারী** নামক প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড পুরাতন নবাব প্রাসাদ অবস্থিত। ইহার নিকটে নবাব বাহাদুরের বর্ত্তমান প্রাসাদ অবস্থিত। হাজারদুয়ারী নবাব নাজিম হুমায়ুনজা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নয় বৎসর সময়ে জেনারেল ম্যাকলাউড নামক এঞ্জিনীয়রের তত্ত্বাবধানে দেশীয় কারিকরের দ্বারা এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। গম্বুজবিশিষ্ট ত্রিতল এই বিরাট প্রাসাদটি ইতালীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্ম্মিত। প্রাসাদের নিম্নতলে তোষাখানা এবং নানা পুরাতন তলোয়ার, বন্দুক, প্রভৃতিতে পূর্ণ অস্ত্রাগার; দোতলায় সুসজ্জিত দরবারঘর, বৈঠকখানা, খাবারঘর প্রভৃতি এবং তেতলায় বহু পুরাতন পুস্তকাদি পূর্ণ গ্রন্থাগার, শয়নকক্ষ এবং নাচঘর অবস্থিত। এই প্রাসাদে পুরাতন প্রথায় অঙ্কিত নবাব নাজিমদিগের এবং অন্যান্য বহু সুন্দর সুন্দর চিত্রাদি রক্ষিত আছে।

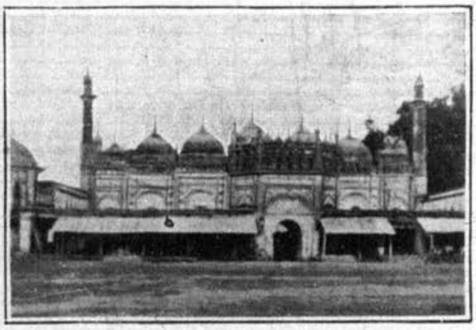


ইমামবাড়া

নিজামত কেল্লার মধ্যে হাজারদুয়ারীর উত্তরে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ **ইমামবাড়া** অবস্থিত। ইহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলি বা ফেরিদুনজা কর্ত্তৃক মাত্র ৮।১০ মাসের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। হুগলীর বিখ্যাত ইমামবাড়া অপেক্ষাও ইহা বৃহৎ। বাংলাদেশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইমামবাড়া; দৈর্ঘ্যে ইহা ৬৮০ ফুট। ইহার ভিতর বাঁশ, রঙীন কাপড় ও কাঁচ দিয়া নির্ম্মিত শতাধিক বর্ষ পুরাতন দুইটি কৃত্রিম পাহাড় আছে। মহরমের সময় তাজিয়ার সহিত এখনও ইহাদের বাহির করা হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমামবাড়াটি আগুন লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পর বর্ত্তমান ইমামবাড়াটি নির্ম্মিত হয়। রিয়াজ-উস্-সলাতীন সিরাজ-উদ্দৌলার ইমামবাড়ার বহু প্রশংসা করিয়াছেন; ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে মুর্শিদাবাদে এরূপ সুন্দর ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আর নাই এবং সারা হিন্দুস্থানে ইহার তুলনা মেলে না। ইহার অনুকরণে মুর্শিদাবাদে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার নিজ নিজ গৃহ-ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। সিরাজের ইমামবাড়ার অবশিষ্ট আছে পুরাতন মেদিনা টুকু; উহা বারদুয়ারী

প্রাসাদ ও বর্ত্তমান ইমামবাড়ার মধ্যে অবস্থিত। মেদিনার নীচে এক মানুষ পর্য্যন্ত মাটি কাটিয়া যথারীতি কার্ব্বালা হইতে মাটি আনিয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছিল।

শহরের দক্ষিণে হাজারদুয়ারী প্রাসাদের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বহরমপুরে যাইবার পুরাতন পথের উপর অশ্ব ক্ষুরাকৃতি সুপ্রসিদ্ধ মোতিঝিল অবস্থিত। কাশ্মীরেও একটি মোতিঝিল আছে। কাহারও মতে ইহা ভাগীরথীর পুরাতন একটি খাদ এবং অপর মতে ইহার ধারে অট্টালিকা নির্ম্মাণের ইটের জন্য ঝিল খনন করিয়া মাটি লওয়া হয়। ইহাতে অনেক অল্প মূল্যের মুক্তা পাওয়া যায় বলিয়া মোতিঝিল নাম হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ঝিলের জল কমিয়া গেলে এই সকল মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ মোতিঝিলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পশ্চিম তীরে সাঙ্গীদালান নামক প্রাসাদ, একটি মস্‌জিদ ও অন্যান্য অট্টালিকা ও উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন; গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া প্রাসাদ নিম্মিত হইয়াছিল। মোতিঝিলের উদ্যান বাটিকা তিনদিকে ঝিলদ্বারা স্বাভাবিক



মোতিঝিল

পরিখায় রক্ষিত ছিল; পশ্চিম দিকে একটি বিশাল তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোতিঝিলের প্রাসাদ ক্রমে ভাঙ্গিয়া আসিলে নবাব মনসুর আলি খাঁর সময়ে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; উহার ভগ্নাবশেষ এবং তোরণদ্বারের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মস্‌জিদটি এখনও বিদ্যমান; ইহার গম্বুজ তিনটি হইতে সুন্দর প্রতিধ্বনি বাহির হয়। এই মস্‌জিদের মধ্যে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ, তাঁহার দত্তকপুত্র ও সিরাজ উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক্রাম উদ্দৌলা, তাঁহার শিক্ষক ও ধাত্রীর সমাধি আছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ অধিকাংশ সময় মোতিঝিলের প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদে কাটাইতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। সৈয়র-মুতাক্ষরীণে লিখিত হইয়াছে যে মুর্শিদাবাদের অভাবগ্রস্ত অনাথ বিধবা সকলে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন এবং মাসে ৩৭,০০০৲ টাকা তিনি ইহাতে ব্যয় করিতেন। তাঁহার অতি প্রিয় দত্তকপুত্র এক্রাম উদ্দৌলা বসন্ত রোগে মারা গেলে তিনি শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁহাকে সমাহিত করিবার জন্য মোতিঝিলের মস্‌জিদে লইয়া আসা হয়, তখন অগণিত নরনারী সঙ্গে আসিয়াছিল।

সৈয়র-মুতাক্ষরীণে লিখিত হইয়াছে যে কবরের মধ্যে নামইবার জন্য মৃতদেহ যখন তুলিয়া ধরা হয় তখন এই জনসমুদ্র হইতে এরূপ শোকধ্বনি ও রোদন উত্থিত হইয়াছিল যেন আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহার তুলনা কেহ কখনও দেখে নাই। ইহা হইতে নওয়াজেসের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৪এ জুলাই ইংরেজ সৈন্যের হস্তে এই মোতিঝিলে নবাব মীর কাসিমের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া গিরিয়ায় গিয়া শিবির স্থাপন করে। ইংরেজদের দেওয়ানী গ্রহণের পর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মোতিঝিল প্রাসাদে ক্লাইভ ধুমধামের সহিত প্রথম পুণ্যাহ সম্পন্ন করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর মোতিঝিলে পুণ্যাহ হইয়াছিল; ইহার পর রাজস্ব বিভাগ কলিকাতায় চলিয়া যায়। মোতিঝিলের প্রাসাদে নবাব দরবারের ইংরেজ রেসিডেন্টগণ কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

মোতিঝিলের পূর্ব্ব তীরে **কোঁয়ারপাড়া** বা কুমারপুর গ্রামে রাধামাধবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে একটি বড় মেলা হয়। কথিত আছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ জীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া এই স্থানে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; অপর মতে হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য জীব গোস্বামীর বংশীয় বংশীবদন গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি, এক্রাম উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ মন্দিরের বাদ্যধ্বনিতে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য গোঁসাঞজীর নিকট মুসলমানী খানা পাঠাইয়া দেন। গোঁসাঞজীর সম্মুখে থালার ঢাকা খুলিলে দেখা গেল খানার পরিবর্ত্তে এক ছড়া যুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ এই খবর অবিশ্বাস করিয়া পুনরায় নিজে দেখিয়া খানা প্রেরণ করেন। সে বারও খানার বদলে যুঁই ফুলের মালা পাওয়া গেল। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং গোঁসাঞজীকে ভক্তি করিতে থাকেন। তিনি মন্দিরের সমীপস্থ চারিটি ঘাটের নিকট মাছ ধরিতে বা পাখী মারিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারি করেন।

মোতিঝিলের পূর্ব্বদিকে **মুবারক মঞ্জিল** নামে নবাব বাহাদুরদিগের একটি মনোরম উদ্যান আছে; মুর্শিদাবাদের পতনের শেষের দিকে এই স্থানে নিজামত আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালত অবস্থিত ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই পরিত্যক্ত বাটীগুলি নবাব হুমায়ুনজাকে বিক্রয় করা হয় এবং তিনি তথায় লাল বাংলা নামক একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে একটি সুন্দর উদ্যানে পরিণত করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমদিগের সুপ্রসিদ্ধ মসনদ যাহা এক্ষণে কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিছুকাল লাল বাংলায় রক্ষিত ছিল। ১৮১৭ হইতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ফেণ্ডাল্ সাহেবের নামানুসারে লোকে মুবারক মঞ্জিলকে **ফেণ্ডালবাগও** কহিয়া থাকে।

ভাগীরথীর অপর বা পশ্চিম কূলে অবস্থিত **খোশবাগ, রোশনীবাগ, ফর্হাবাগ** ও **ডাহাপাড়ার** কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের উত্তরে জাফরাগঞ্জের ঠিক অপর পারে মোতিঝিলের অনুকরণে সিরাজ উদ্দৌলা **হীরাঝিল** নামে একটি সুন্দর

ঝিল এবং তাহার তীরে একটি প্রকাণ্ড ও অতি মনোরম বিলাসভবন ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থান সিরাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং এই প্রাসাদেই মসনদ স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য সমাধান করিতেন। সিরাজের উপাধি মনসুর-উল-মুলক হইতে স্থানটির নাম মনসুরগঞ্জ ও প্রাসাদটি **মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ** বা লালকুঠি নামে অভিহিত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া এই প্রাসাদ নিম্মিত হয় এবং ইহাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে সিরাজ বহু আয়াস পাইয়াছিলেন। প্রাসাদ নিম্মিত হইলে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী প্রভৃতি ইহা দেখিতে আসিয়া সিরাজ উদ্দৌলার মাৰ্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রিতে লুৎফউন্নেসার সহিত জন্মের মত সিরাজ তাঁহার এই প্রিয় প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। নবাব হইয়া মীরজাফরও প্রথমে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে অবস্থান করেন; পরে নিজামত কেল্লায় আলিবর্দ্দীর প্রাসাদে চলিয়া যান। হীরাঝিল ও মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের চিহ্নই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ঝিলটি ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাসাদের অবস্থাও তাহাই; কেবল দু একটি ভিত ও চত্বর দেখিতে পাওয়া যায়। হীরাঝিলের উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে **মুরাদবাগে** ক্লাইভ, হেষ্টিংস্ এবং অন্যান্য ইংরেজ রেসিডেন্টগণ বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানও প্রায় ভাগীরথীর গর্ভে গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত। এককালে ভাগীরথীর উভয় কূল ব্যাপিয়া প্রাসাদে অট্টালিকায় ঝলমল করিত। পলাশীযুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে ক্লাইভ লিখিয়াছিলেন যে এই নগরী লণ্ডন নগরীর মতই বিস্তৃত, জনাকীর্ণ ও ধনশালী; শুধু পার্থক্য এই যে পূর্ব্বোক্ত শহরের অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ লণ্ডনবাসিগণের অপেক্ষা অসীম ধনবান।

মুর্শিদাবাদের কথা শেষ করিবার আগে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ **ব্যারা** বা বেরা পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্রিকালে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ খাজা খিজিরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোকমালায় বিভূষিত করিয়া বাঁশ ও কলা গাছের শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী বর্ষাস্ফীত ভাগীরথীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। প্রধান আলোকযান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১২০ ও ৯০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের গৌরবময় যুগে ইহা আরও অনেক বড় হইত। বহু সংখ্যক কলা গাছ বাঁধিয়া বাঁশ ও বাখারির সাহায্যে রঙীন কাগজ দিয়া নানারকম ঘর বাড়ী ও যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য প্রদীপ দিয়া এগুলিকে সজ্জিত করা হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট বহু যান ও অগণিত কমল (কর্পূর-পূর্ণ মাটির প্রদীপ) ভাসিতে থাকে। মুর্শিদাবাদের নবাববংশীয়গণ জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া জাফরাগঞ্জের নিকট নদী তীরে গিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। কতকগুলি সিপাহী ও নিজামতী ব্যাণ্ড খাজা খিজিরের জন্য রুটি, ক্ষীর, পান প্রভৃতি লইয়া প্রধান আলোকযানে আরোহণ করিলে ধীরে ধীরে নদী বক্ষে এই আলোকমালা সঙ্গীত যোগে চলিতে থাকে। নদীবক্ষ ও তীর হইতে নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর আতসবাজী আকাশে উঠিয়া উৎসবের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের পশ্চিম তীরে রোশনীবাগে বাঁশ দিয়া ত্রিতল গৃহাদি

নির্ম্মিত করিয়া আলোকমালায় সজ্জিত করা হইত; নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া ইহারা আলোক-উৎসবের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত করিত; ইহা হইতেই রোশনীবাগের নামের উৎপত্তি। এক্ষণে রোশনীবাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কথিত। ব্যারার জাঁকজমক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইলেও ইহা এখনও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় উৎসব এবং বহু স্থান হইতে এই উপলক্ষে জন সমাগম হয়।

সিরাজ উদ্দৌলা ব্যারার পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার **নাওয়ারা** নামে আর একটি উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া কথিত। উক্ত দিবসে বৈকাল বেলায় বহু সুসজ্জিত তরণী লইয়া নদীজলে অগণিত কদম্ব ফুলের মালা ভাসাইয়া নবাব নদীবক্ষে দরবার করিতেন। এ উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আজ মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইলেও অতীতের বহু স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বাংলার এই পুরাতন রাজধানী শিক্ষার্থী, ভ্রমণকারী ও অনুসন্ধিৎসুর নিকট তীর্থরূপে বিরাজ করিতেছে।

বন্যা নিবারণের জন্য ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে ভগবানগোলা হইতে প্রায় পলাশী পর্য্যন্ত **ললিতাকুরী** বাঁধ নামে প্রায় ৫৭ মাইল লম্বা একটি বাঁধ আছে। এই বাঁধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যদিও ইহার জন্য মুর্শিদাবাদ অঞ্চল বন্যার হাত হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু বন্যার জলের পলিমাটি হইতে বঞ্চিত হইয়া জমির উর্ব্বরা শক্তির ক্ষতি হয় এবং এই পলি নদী গর্ভে জমিয়া নদীতল উচ্চ হইয়া উঠিয়া নদী প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে।

নশীপুর রোড—কলিকাতা হইতে ১২৫ মাইল দূর। নশীপুরে পশ্চিম দেশীয় অগ্রবাল বণিক্ জাতীয় এক ঘর বড় জমিদারের বাস। এই বংশ নশীপুরের রাজবংশ নামে পরিচিত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেবীসিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুর্শিদাবাদের গৌরবের দিনে ভাগ্যান্বেষী দেবীসিংহ সুদূর পাণিপথ হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু চেষ্টা ও উমেদারির পর তিনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার ইজারা ও সেই সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত হন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা তাঁহার চরিত্রকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে! হেষ্টিংস্ বাধ্য হইয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দেবীসিংহকে পূর্ণিয়ার কার্য্য হইতে পদচ্যুত করেন কিন্তু পরে আবার তাঁহাকে দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের ইজারা প্রদান করিয়া দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান পদে প্রেরিত করেন! তিনি পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং উত্তর বঙ্গে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার করভার, নিপীড়ন ও নানা অত্যাচারে অবশেষে উত্তর বঙ্গের প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং উহা দমন করিবার জন্য কোম্পানির সৈন্যগণের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। মোগলহাট, পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষকে দেবীসিংহের অত্যাচারের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী"তে

দেবীসিংহের উৎপীড়নের উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন এবং এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া এডমণ্ড বার্ক দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের দুর্ব্বিসহ অত্যাচার অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন।" দেবীসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র বলবন্ত সিংহকে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বলবন্ত সিংহের পুত্র গোপালসিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় দেবীসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর সিংহের অপর বংশধরেরা জমিদারীর অধিকারী হন। বাহাদুর সিংহের তৃতীয় পুত্র রাজা উদ্বন্ত সিংহ বহু সৎকার্য্যের দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সময় হইতেই নশীপুরের রাজবংশ বংশানুক্রমিক রাজা উপাধির অধিকারী। নশীপুরের রাজবাটী ও ঠাকুরবাটী এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রতিবৎসর মহাসমারোহের সহিত রাজবাটীতে তুলসী বিহার ও ঝুলন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মহিমাপুর—নশীপুরের নিকটবর্ত্তী মহিমাপুরে বিখ্যাত জগৎ শেঠবংশীয় বণিকগণের বাস। জগৎশেঠ কাহারও নাম নহে, ইহা একটি উপাধি বিশেষ। যোধপুর নিবাসী হীরানন্দ শেঠের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ মাণিকচাঁদ বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় একটি গদী সংস্থাপন করেন। সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ানি লাভ করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেন। কার্য্য উপলক্ষে মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। আজিম-উস্-শানের সহিত মনোমালিন্যের ফলে মুর্শিদকুলী যখন ঢাকা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আসেন, শেঠ মাণিকচাঁদও তাঁহার সহগামী হন এবং মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে মহিমাপুরে নিজের বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ইহার দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। মুর্শিদকুলীর সহিত সংস্রবের ফলে শেঠবংশ ক্রমে ক্রমে রাজ্য পরিচালনা বিষয়েও প্রাধান্য লাভ করেন। বাংলার রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে শেঠদিগের হুণ্ডী মারফত প্রেরিত হইত। দিল্লীতে তাঁহাদের আত্মীয়দের গদীতে হুণ্ডী ভাঙ্গান হইত। শেঠ বংশের ঐশ্বর্য্যের কথা প্রবাদের ন্যায় লোকের মুখে মুখে ফিরিত। সারা হিন্দুস্থানে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। কথিত আছে যে তাহাদের গদীতে দশ কোটী টাকার কারবার চলিত। নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটী টাকা লুণ্ঠন করিলেও তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সহিত কোন কারণে শেঠবংশের মনোমালিন্য ঘটে এবং সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির ষড়যন্ত্রে তৎকালীন জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। নানারূপ ঘটনাচক্রে ও কালবশে জগৎ শেঠদিগের বিপুল বিত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ইংরেজ আমলে তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায়। এই বংশীয় ইন্দ্রচাঁদ ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে (লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে) শেষ "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। অবশেষে এই বংশীয়গণের এইরূপ হীনাবস্থা হয় যে ইহারা কয়েক পুরুষ যাবত ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। জগৎ-শেঠগণের বিস্তৃত বাসভবনের অধিকাংশ গঙ্গার গর্ভসাৎ হইয়াছে। ঠাকুরবাটীর প্রাঙ্গনে কয়েকটি সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড অতীতের গৌরবময় স্মৃতি বহন করিতেছে।

শেঠবংশ জৈন হইলেও, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পুনরায় তাঁহারা জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শেঠদিগের বাটীর উত্তরে সতীচৌরা বা সতীস্থান নামে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। এই স্থানে কোনও সতী সহমৃত হওয়ায় মন্দিরটি নিৰ্ম্মিত হয়।

জিয়াগঞ্জ—কলিকাতা হইতে ১২৭ মাইল দূর। ভাগীরতীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত ইহা একটি পুরাতন স্থান। জিয়াগঞ্জ ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নওলাক্ষা, ছুধোরিয়া, কোঠারি ও নাহার প্রভৃতি উপাধিধারী বহু জৈন বণিকের বাস। মুর্শিদাবাদের উন্নতির সময়ে পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া এই বণিকগণ বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিৰ্ম্মিত জৈন মন্দিরগুলি এতদঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু। জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত।

জিয়াগঞ্জের প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। বিন্ধ্যাচলের প্রধান পাণ্ডা গোঁসাইএর বংশীয়া "জিয়া" নামক জনৈকা বৃদ্ধা এখানে আসিয়া ভাগীরথী তীরে বাস করেন। তাঁহার অনুরক্ত বণিকগণ তাঁহার নাম অনুসারে এই স্থানের গাম্ভীলা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জিয়াগঞ্জ নাম রাখেন। গাম্ভীলা বৈষ্ণবগণের নিকট প্রিয় স্থান। নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গাম্ভীলায় বাস করিতেন। এই স্থানেই নরোত্তম গঙ্গানারায়ণের প্রার্থনা অনুসারে চিতা শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন ("খেতুর রোড" দ্রষ্টব্য)। এই গাম্ভীলা পাটেই অতি অদ্ভুতভাবে নরোত্তমের অন্তর্ধান ঘটে। এ সম্বন্ধে "নরোত্তম বিলাসে" উল্লিখিত হইয়াছে।

"বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গা স্নান করিয়া বসিলা গঙ্গা কূলে॥
আজ্ঞা কৈল রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে॥
দোহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে॥
দুগ্ধ প্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে॥"

১৫০৯ শকাব্দে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব ঘটে। আজিও প্রতিবৎসর এই দিনে জিয়াগঞ্জে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গাম্ভীলার মেলায় নরোত্তম ঠাকুরের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি বিক্রয় হইত। জিয়াগঞ্জ নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক সম্প্রতি এইরূপ একটি মূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ "আশুতোষ স্মৃতি চিত্রশালায়" উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি নরোত্তম দাসের সন্ন্যাস অবস্থার। মূর্ত্তিটি হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট ও যুক্তহস্ত। চোখ দুটি ভাব বিহ্বল, দেহ দীর্ঘাকার, নাসিকা উন্নত, বক্ষ প্রশস্ত, মস্তকের কেশরাশি চূড়ারূপে বদ্ধ, মুখমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে প্রায় সমাচ্ছন্ন, অঙ্গের বর্ণ সুবর্ণ কান্তি, পরিধানে রক্ত কৌপীন ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের তিলক। মূর্ত্তিটির কারুকার্য্য অতি সুন্দর। জিয়াগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কুমার পাড়া গ্রামের কুমারগণ এইরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গাম্ভীলার মেলায় বিক্রয় করিত।

জিয়াগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সাধকবাগ অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানে মস্তরাম সাধুর আখড়া অবস্থিত। মস্তরামের প্রকৃত নাম সদানন্দ। তিনি শারীরিক ও যৌগিক শক্তির জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পায়ে হাঁটিয়া তিনি ভাগীরথী পারাপার হইতেন বলিয়া প্রবাদ। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ, আলিবর্দ্দী ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ব্যক্তি। কথিত আছে, একবার নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাকে একখানি শাল ও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। উহা প্রাপ্তিমাত্র তিনি শাল খানিকে সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ও মুদ্রাগুলিকে নদীর জলে ফেলিয়া দেন। এই সংবাদ শুনিয়া আলিবর্দ্দী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রেরিত দ্রব্যগুলি ফেরত চাহিয়া পাঠান। মস্তরাম তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে সেইরূপ দশখানি শাল ও নদীর জল হইতে প্রায় পঞ্চগুণ স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া দিয়া নবাবের বিস্ময় উৎপাদন করেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে একখানি ঢাল ও তরবারি উপহার দেন। আলিবর্দ্দী প্রদত্ত ঢাল ও তরবারি এখনও সাধকবাগের আশ্রমে দেখিতে পাওয়া যায়। নাটোরের মহারাণী ভবানী, বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণ ও মহিষাদলের রাজা প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মস্তরামের একান্ত অনুগত ছিলেন। মস্তরাম বাবাজীর খড়ম, যষ্টি ও ব্যবহৃত কয়েকটি অলঙ্কার সাধকবাগে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। রোগ আরোগ্য কামনায় ও বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় এখনও বহু ব্যক্তি এই আখড়ায় পূজা দিয়া থাকেন। রথযাত্রা উপলক্ষে আখড়ায় সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

সাধকবাগের অপরপারে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বড়নগর অবস্থিত। পূর্ব্বভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল বারহাড়োয়া শাখার "আজিমগঞ্জ জংশন" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

ভগবানগোলা—কলিকাতা হইতে ১৩৪ মাইল। বর্ত্তমানে ইহা একটি নগণ্য পল্লী হইলেও এক সময়ে বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। বর্ত্তমান ভগবান গোলা রেল স্টেশন হইতে পুরাতন ভগবানগোলা প্রায় ৪ মাইল দূর। ইহার একদিকে ভাগীরথী, অপর দিকে জলঙ্গী ও নিকটেই পদ্মা প্রবাহিত হইত। দেশ বিদেশ হইতে আগত বাণিজ্য তরীতে ভগবান গোলা তখন সুশোভিত থাকিত। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের সময়ে ইহার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঐতিহাসিক হলওয়েল লিখিয়াছেন তৎকালে ভগবানগোলায় ধান্য, দাইল, পলাণ্ডু প্রভৃতি শস্য, তুলা, রেশম, বস্ত্র, নীল, ঘৃত,. তৈল প্রভৃতি ব্যবসায়ের একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল এবং এই গঞ্জ হইতে বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকার কর উঠিত। এত বড় বাজার তৎকালে পৃথিবীর আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। শোভাসিংএর বিদ্রোহ কালে তাঁহার সহযোগী রহিম খাঁর সহিত ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ভগবানগোলায় মুঘল পক্ষীয় জবরদস্ত খাঁর ভীষণ যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া বর্দ্ধমানের দিকে পলাইয়া যায়। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব কালে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নদীতীর ব্যতীত ভগবানগোলার অন্যান্য দিকে পরিখা খনিত ও কাষ্ঠের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই স্থানে নবাবের নৌ সেনার আড্ডা ছিল। ভাস্কর পণ্ডিত ও আলিভাইএর নেতৃত্বে মহরাষ্ট্রীয়গণ চারিবার ভগবান গোলা আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হয়। অতঃপর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বর্গীগণ পুনরায়

এই স্থান আক্রমণ করে ও নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া যায়। পুরাতন আমলের কতকগুলি পরিখার চিহ্ন ছাড়া বর্ত্তমানে ভগবানগোলায় বিশেষ দ্রষ্টব্য অন্য কিছুই নাই।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজ উদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন, তখন এই ভগবানগোলা হইতেই নৌকা যোগে রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হীবার এই স্থান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীতে ইহার শান্ত শ্যামল পল্লীশ্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

ভগবানগোলার নিকটবর্ত্তী তেলিয়া বুধুরি গ্রাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ ও তদীয় অনুজ বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম দাসের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্বকৃত পদে নরোত্তম দাস বহু স্থানে রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে ঘোর শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপায় দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে তেলিয়া বুধুরী গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য আসিলে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। গোবিন্দ দাসের রচিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

ভগবানগোলার নিকটস্থ বিল সমূহে মোতিঝিলের ন্যায় অল্প মূল্যের মুক্তা পাওয়া যায়।

লালগোলা—কলিকাতা হইতে ১৪১ মাইল দূর। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে রাজা উপাধিধারী একঘর পশ্চিম দেশীয় জমিদারের বাস। আচারে ব্যবহারে এই বংশ এখন পুরাপুরি বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। এই রাজবংশের বহু কীর্ত্তি মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্য সেবিগণের বিশেষ উৎসাহ দাতা।

প্রতিবৎসর মহাসমারোহে লালগোলায় রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

লালগোলা হইতে ৪ মাইল দূরে পদ্মার তীরে লালগোলাঘাট স্টেশন। এই স্থান হইতে রেলের খেয়া-স্টীমারে করিয়া প্রায় আট মাইল দূরবর্ত্তী পদ্মা ও মহানন্দার সঙ্গমের নিকট অবস্থিত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ীঘাটে গিয়া মাঝারি মাপের লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া মালদহ ও কাটিহার যাইতে হয়। লালগোলাঘাটের দৃশ্য অতি সুন্দর, বিশেষতঃ বর্ষাকালে পদ্মার গৈরিক জলোচ্ছ্বাসে যখন পদ্মা ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ চরভূমি জলে ডুবিয়া যায়, তখনকার দৃশ্য আরও সুন্দর। পদ্মার তীরে অবস্থিত বলিয়া লালগোলাঘাট স্টেশনটিকে প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে সরাইয়া লইতে হয়। সেই জন্য স্টেশনের অফিস প্রভৃতি পদ্মা মধ্যবর্ত্তী একখানি বড় ফ্লাটের উপর অবস্থিত।

গোদাগাড়ী—গোদাগাড়ী ঘাটের পরের স্টেশন গোদাগাড়ী কলিকাতা হইতে ১৫৭ মাইল দূর। বর্ত্তমান রেল স্টেশন হইতে পুরাতন গোদাগাড়ী প্রায় দুই মাইল দূরে মহানন্দার তীরে অবস্থিত। গোদাগাড়ী একটি পুরাতন বন্দর। বর্গীর হাঙ্গামার সময় যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা মুর্শিদাবাদের আশ-পাশ ও ভগবানগোলা লুণ্ঠন করিতে আসিত, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান ধনজন সহ গোদাগাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। একবার বর্গীর ভয়ে স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ধনরত্ন ও স্ত্রী কন্যাদি স্বীয় জামাতা নওয়াজেশ্ মহম্মদ খাঁর তত্ত্বাবধানে গোদাগাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন গোদাগাড়ীতে সেই সময়ের নির্ম্মিত একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ্ এবং একটি কেল্লার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। গোদাগাড়ীর সন্নিকটে রাজশাহী জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া একটি নদী পদ্মা বা গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদীটিও পদ্মা নামে অভিহিত। কেহ কেহ মনে করেন গঙ্গা যখন ভাগীরথীর খাদ ছাড়িয়া ক্রমেই পূর্ব্ব দিকে বহিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র নদীটির খাত দিয়া প্রবাহিতা হওয়ায় ইহারই নাম পদ্মা হইয়াছে।

আমনুরা জংশন—কলিকাতা হইতে ১৭১ মাইল দূর। গোদাগাড়ী ছাড়িয়া আমনুরার দিকে কিছু দূর যাইলেই বরেন্দ্র ভূমির বিশিষ্ট দৃশ্য আরম্ভ হইবে। উঁচু নীচু লাল মাটির বিস্তৃত প্রান্তরে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া অসংখ্য তাল গাছ সত্যই মনোরম মনে হয়। বাংলার সাধারণ দৃশ্য হইতে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বীরভূম ও মেদিনীপুরের সীমান্ত ভূমির দৃশ্যের সহিত। আমনুরা পূর্ব্বে একটি ছোট স্টেশন ছিল। কিন্তু প্রধান লাইনের আব্দুলপুর হইতে মালদহ জেলার মহানন্দা তীরবর্ত্তী গঞ্জ চাপাই-নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত বড় মাপের লাইন নির্ম্মিত হওয়ার পর বড় মাপের ও মাঝারি মাপের লাইনের জংশন স্টেশনরূপে আমনুরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই স্টেশনটিকে অবলম্বন করিয়া মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি ছোট শহর গড়িয়া উঠিতেছে।

আমনুরা স্টেশন অতিক্রম করিবার পর গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইলে লাইনের দুই দিকে মধ্যে মধ্যে উচ্চ জাঙ্গাল দৃষ্ট হয়। এই উচ্চ জাঙ্গালের নামই বরিন্দ বা উচ্চ ভূমি। ইহার নাম হইতেই উত্তর বঙ্গের একাংশের নাম বরেন্দ্র ভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে বরিন্দ অঞ্চলে বহু অরণ্য ছিল। সাঁওতালেরা আসিয়া বহু পুরুষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যের অধিকাংশকে এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। বরেন্দ্র ভূমির মৃত্তিকার রঙ সাধারণতঃ লাল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চল যে বহু পুরাতন সে কথা "বাংলার সাধারণ পরিচয়" অধ্যায়ে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রোহনপুর—কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল দূর। ইহা পুনর্ভবা নদীর উপর অবস্থিত। স্টেশনের উত্তরেই ইহার উপর রেলওয়ে সেতু। পুনর্ভবা এক মাইলের কিছু উত্তর পশ্চিম দিকে গিয়া মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে। রোহনপুর এ অঞ্চলে ধান ও চাউলের কারবারের একটি প্রধান কেন্দ্র।

মালদহ—কলিকাতা হইতে ২০৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে মহানন্দা পার হইয়া মালদহ শহরে পৌছিতে হয়। মালদহের পুরাতন নাম ইংরেজবাজার। পুরাতন মালদহে যখন রেশমের বড় আড়ং ছিল তখন ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই স্থানে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কুঠি তথা হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। কুঠির চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়া সুরক্ষিত ছিল; ইহা এখন আদালত ও সরকারী দপ্তররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ওলন্দাজ ও ফরাসীরাও এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন! মুসলমানেরা রাজ্য হারাইলে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া ইংরেজবাজার ক্রমশঃ জেলার সদর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহানন্দা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া শহরের সহিত স্টেশনকে সংযুক্ত করিয়া দিবার একটি প্রস্তাব আছে। এখন খেয়া নৌকাযোগে গোরুরগাড়ী, মোটর প্রভৃতি পারাপারের ব্যবস্থা আছে। বর্ষাকালে মহানন্দার জলোচ্ছ্বাস হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য নদী তীর দিয়া একটি উচ্চ বাঁধ আছে। মহানন্দা মালদহ



বৃন্দাবনী আমগাছ, মালদহ

জেলার প্রধান নদী। মহানন্দার প্রাচীন নাম নন্দা বা অপরনন্দা। মহানন্দা প্রাচীন নদী। মহাভারতে কৌশিকী নদীর পর নন্দা ও অপরনন্দা নামক দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। মহানন্দা তাহাদের অন্যতম। মালদহ কতদিনের প্রাচীন স্থান তাহা বলা কঠিন। রামায়ণে মলদ ও করুষ নামে দুইটি স্থানের নাম আছে। কথিত আছে, তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে এস্থান দুইটি নির্ম্মনুষ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অনার্য্যদের উৎপাতে এস্থানের আর্য্যদের উপনিবেশ বিনষ্ট হইয়াছিল। পৌরাণিক ভূগোলেও মলদ বা মালদরাজ্যের নাম আছে। মালদহের সহিত এই মলদরাজ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

মালদহের পার্শ্বস্থ বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান যুগের রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়া এই স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

মালদহ আমের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এখান হইতে প্রতি বৎসর ৮।১০ লক্ষ টাকার আম নানা দেশে রপ্তানি হয়। এখানে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট আম হয়, তাহাদের মধ্যে গোপালভোগ, ফজলী, বৃন্দাবনী, খিরসাপাতি, মোহনভোগ, লম্বা ভাদুড়ে, আশ্বিনা,

কোহাপাহাড়িয়া প্রভৃতি প্রধান। বর্ত্তমানে ল্যাঙ্গড়া প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। মালদহের এই আমের খ্যাতি দুই শত বৎসরের অধিক নহে। এখানকার কাছারীর হাতার মধ্যে যে বিস্তৃত মাঠ আছে, তাহার মধ্যে একটি শত বর্ষের প্রাচীন আম গাছ আছে। এই গাছটি বৃন্দাবনী আম গাছ বলিয়া বিখ্যাত। শাখা প্রশাখায় সুবিস্তৃত এই আম গাছটির ঘনপল্লব ও শ্যামপত্রাবরণযুক্ত শোভা সকলেরই মনোরঞ্জন করে।

মালদহের রেশম-শিল্প জগদ্বিখ্যাত। গৌড়ের হিন্দু রাজাদের সময়ও এখানকার পট্ট বস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল এবং সপ্তগ্রাম, ঢাকা ও সুবর্ণ গ্রামে রপ্তানি হইত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখ ভীক্ নামে মালদহী বস্ত্রের ব্যবসায়ী তিন জাহাজ রেশমী কাপড় লইয়া রুশিয়ায় যাত্রা



জহরাকালী, মালদহ

করিয়াছিল, তাঁহার দুইটি জাহাজ ইরাণীয় উপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুরাতন মালদহে ওলন্দাজদিগের একটি রেশমের কুঠি ছিল; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির কুঠি পরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশমী সূতা এই জেলায় প্রস্তুত হয় এবং ৬৫ হইতে ৭০ লক্ষ টাকার রেশমী সূতা ও কাপড় এখান হইতে রপ্তানি হয়। এই ব্যবসায়টির বেশীরভাগ মাড়োয়ারীদের দ্বারা

পরিচালিত হয়। এখানকার রেশমী ধুতি, শাড়ী ও রুমালের বিশেষ খ্যাতি আছে। উদ্ধু, গুল বিশি, বুল বুল চশম, চাঁদতারা, কদমফুলী, মাপচর, কলিস্তরাক্ষী (কপোতাক্ষী ?) প্রভৃতি নানা রকম রেশমী ও রেশমী-সূতী মিশ্র কাপড় এখানে প্রস্তুত হয়। রং করিবার জন্য এখান হইতে মট্‌কা মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানি হয়। জাপানী প্রভৃতি বৈদেশিক রেশমী বস্ত্রের আমদানীর জন্য এই পুরাতন শিল্পের আজ কাল ক্ষতি হইতেছে। মালদহে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত একটি সেরিকালচারাল ফার্ম্ আছে।

মালদহ শহরের মধ্যে দর্শনীয় স্থান হইতেছে—রিয়াজ-উস্-সলাতীন প্রণেতা গোলাম হুসেনের কবর, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ও জহরতলা থান নামে পরিচিত প্রাচীন শক্তিপীঠ প্রভৃতি। মালদহের চিত্রশালায় বরেন্দ্রভূমি হইতে সংগৃহীত বহু প্রস্তর



গান্ধীধর্ম্মশালা, মালদহ

মূর্ত্তি ও শিলালিপি প্রভৃতি রক্ষিত আছে। অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। মালদহ শহরে একটি বড় মসজিদ আছে। উহা আকবরের রাজত্বকালে জনৈক ধনী বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মালদহ পূর্ব্বে শাক্ত প্রধান স্থান ছিল। এস্থানে মঙ্গলচণ্ডী, কালী ও সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর পূজার বেদী সর্ব্বত্র দেখা যাইত এবং বাশুলি, মশান-চামুণ্ডা প্রভৃতি অনেক পিশাচ-দেবতার পূজা হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মালদহ জেলার অনেকেই বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিয়াছেন। এখন মালদহকে একটি বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী মালদহে আসিয়াছিলেন।

মোক্‌হুম্ শাহ, কুতুব শাহ ও পিরাণপীর (আখিসেরাজ) এই তিন জন পীর মালদহে বিশেষ বিখ্যাত। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ইহাদের বিষয়ে নানারূপ গল্প ও কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। গল্প আছে, মোকহুম শাহ বাঘের উপর চড়িয়া বেড়াইতেন এবং খড়ম পায়ে দিয়া নদী পার হইতেন।

মালদহের "গম্ভীরা" নামক লোক সঙ্গীত জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রচলন আছে। সাধারণতঃ বৎসরের শেষে চৈত্র মাসের শেষ তিন দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি সামিয়ানার নীচে শিবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এই উৎসব পালিত হয় এবং বিগত বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী নৃত্য, গীত ও অভিনয় সহযোগে সমালোচিত হয়। দিনাজপুর অঞ্চলের শিব ভক্ত বাণরাজা এই উৎসব প্রচলন করেন বলিয়া কথিত। পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানগণের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গম্ভীরা রচিত হইত। রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরে সমসাময়িক সমাজ-নৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই সঙ্গীতের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

মালদহ স্টেশনের কাছে একটি ধর্ম্মশালা আছে। তিন দিন পর্য্যন্ত তথায় বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত শহরের মধ্যে একটি পান্থশালা আছে। এই পান্থশালায় দৈনিক এক পয়সা করিয়া ভাড়া হিসাবে দিতে হয়।

মালদহ শহরে মাড়োয়ারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গান্ধী ধর্ম্মশালা নামে একটি বড় ধর্ম্মশালা আছে। হিন্দুমাত্রেই এখানে বিনা ভাড়ায় তিন দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন। এই ধর্ম্মশালাটি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মালদহ শহরে হিন্দু ও মুসলমানের হোটেলের অভাব নাই। মালদহের মোহনভোগ, রসকদম্ব ও খাজার বেশ নাম আছে।

মালদহ হইতে নৌকাপথে ৬ মাইল দক্ষিণে মহানন্দার দক্ষিণ কূলে ভোলাহাট একটি বৃহৎ গ্রাম; ইহা একটি রেশম শিল্পের কেন্দ্র। গ্রামের প্রধান রাস্তার উপর গৌড় হইতে আনীত একটি সুন্দর কারুকার্য্য মণ্ডিত ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড়—ইংরেজ বাজার বা বর্ত্তমান মালদহ শহর হইতে বাংলার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান যুগের রাজধানী ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গৌড়ের শেষ সীমানা ইংরেজ বাজার হইতে ১২ মাইলেরও অধিক। বরাবর পাকা রাস্তা আছে এবং ট্যাক্সি, বাস বা গরুর গাড়ী করিয়া সহজেই এই বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাচীন রাজধানী দেখিয়া আসা যায়। বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শহরের চারি দিকে তৎকালে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল উহা এখনও বর্ত্তমান; দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে উহা সাড়ে সাত মাইল এবং প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল।

গৌড় নামের প্রসিদ্ধি ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে "বাংলার সাধারণ পরিচয়" অধ্যায়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌড় নাম এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচটি গৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে; ইহাদের মধ্যে বাংলা দেশের গৌড়ই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বাংলার প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেরই "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই ভূভাগের রাজা ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে গৌড়ের এবং গৌড়ভট্টদিগের লগুড় যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতার কথা আছে। এ অঞ্চল পুরাকালে গুড়ের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করায় গুড় হইতে গৌড় নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ

অনুমান করেন। গৌড়সারঙ্গ গৌড়ী প্রভৃতি রাগ রাগিণীর নাম হইতে পুরাকালে এই স্থানের সংস্কৃতিগত উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লী ও উত্তর ভারতের গৌড় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা বংশ পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন যে তাঁহাদের আদি পুরুষ গৌড় হইতে মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উত্তর ভারতে বাস স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতন ও ক্ষমতা লোপের সহিত বাংলায় স্থানীয় শাসকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীন রাজা হইয়া পড়েন। যুক্ত প্রদেশের বড়বাঁকি জেলার হড়াদা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মৌখরী বংশীয় রাজা ঈশান বর্ম্মা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত গৌড় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে গৌড় তখন স্বাধীন ছিল। শিলা লিপিতে গৌড়গণকে "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে। "ইহা হইতে বোধ হয় সূচিত হইতেছে যে গৌড়গণ নৌবলে বলীয়ান্ ছিলেন।" ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারি খানি তাম্র লিপি হইতে জানা যায় এই যুগে দক্ষিণবঙ্গে ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব নামে রাজা ছিলেন। ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে দেখা যায় তাঁহার সময়ে গৌড়ের অংশ-বিশেষের শাসক ছিলেন মহারাজ স্থাণু দত্ত। ইহার পর রাজা শশাঙ্ক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়াধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে। (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার চিরোতী স্টেশন দ্রষ্টব্য)। কহ্লন মিশ্র প্রণীত "রাজ তরঙ্গিনীতে" বর্ণিত আছে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কান্যকুব্জের পরাক্রান্ত রাজা যশোবন্তকে পরাস্ত করিয়া মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিলে গৌড়পতি বহু হস্তী উপহার দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন; তাঁহার নিমন্ত্রণে গৌড়পতি কাশ্মীরে যাইলে, পরিহাসপুর বা বর্ত্তমান পরসপোর নগরের পরিহাসকেশব মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে ললিতাদিত্য প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি অতিথির কোনও ক্ষতি করিবেন না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং ত্রিগামী নামক স্থানে গৌড়পতিকে হত্যা করেন। এই বার্ত্তা শুনিয়া গৌড় হইতে একদল যোদ্ধা প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীর গমন করিয়া পরিহাসকেশবের মন্দির অবরোধ করেন এবং ভ্রমবশতঃ পরিহাসকেশবের পরিবর্ত্তে রাম স্বামীর রজতবিগ্রহ ধ্বংস করিয়া যুদ্ধে প্রাণ দান করেন। অনুমিত হয় ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কহ্লনের সময়েও কাশ্মীরে গৌড়বাসিগণের বীরত্বের খ্যাতি ছিল এবং রাম স্বামীর মন্দির শূন্য পড়িয়াছিল। কহ্লন গৌড়বাসিগণকে গৌড়রাক্ষস বলিয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীতে আরও লিখিত আছে, যে ললিতাদিত্যের পৌত্র কাশ্মীর রাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বাহির হইলে সেই সুযোগে তাঁহার শ্যালক জজ্জ কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করেন; জয়াপীড় তখন নিজ সৈন্য দিগকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত জয়ন্ত নামক সামন্তরাজের অধীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার কথা প্রকাশ হইলে রাজা জয়ন্ত তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়াপীড়ের সহিত বিবাহ দেন। জয়াপীড় গৌড়ের পাঁচজন নরপতিকে হারাইয়া শ্বশুরকে গৌড়ের সর্ব্বময় অধীশ্বর করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কহ্লন মিশ্র বর্ণিত কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ও বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের গৌড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সত্য কিনা সে

বিষয়ে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক, অনেকে মনে করেন গৌড়পতি জয়ন্তই পরে আদিশূর নামে খ্যাত হন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। এই শূরবংশীয় এগার জন রাজার পর অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ পালবংশীয় রাজগণের অভ্যুত্থান হয়। শূরবংশীয় রাজগণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান।

বহুকাল ধরিয়া দেশে শক্তিশালী রাজার অভাবে বাহির হইতে বার বার আক্রমণ ও মৎস্যন্যায় বা অরাজকতায় অতিষ্ঠ হইয়া প্রজাগণ মিলিত হইয়া "সর্ব্ববিদ্যাবিৎ" দয়িত-বিষ্ণুর পৌত্র ও "খণ্ডিতারাতি" ব্যপটের পুত্র গোপালকে গৌড়ের রাজা নির্ব্বাচিত করেন। ইনিই প্রথম গোপালদেব নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এবং গৌড়বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ এই সময়কার গৌড়বঙ্গের অবস্থার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "প্রতিদিন এক এক জন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছু দিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" গৌড়ের নিকটবর্ত্তী খালিমপুর গ্রামে প্রথম গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইতেও প্রথম গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা জানা যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন প্রথম গোপালদেবের রাজ্য কাল হইতেই গৌড় নগরের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে এবং বাংলার পালবংশীয় রাজাদিগের সময়েই গৌড় মহানগরীর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হয়। গোপালদেব রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া ও শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া মগধে একটি বিশাল বিহার স্থাপন করেন এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান বিহার নগর ও বিহার প্রদেশের নামের উৎপত্তি। গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপালের রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল, তিনি কান্যকুব্জ জয় করিয়া ইন্দ্ররাজের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন। তাঁহার খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার প্রাধান্য সুদূর সিন্ধু, কান্দাহার, পঞ্জাব ও কাঙ্গড়ার রাজগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ছিলেন। তিনি জামালগঞ্জের নিকট পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার ও ভাগলপুরের নিকট বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃরাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন ও কম্বোজ, কামরূপ, উৎকল, গুর্জ্জর ও রাষ্ট্রকূটরাজদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপাল-দেবের মুঙ্গেরে ও নালন্দায় দুখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; উভয় তাম্রশাসনেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ ও "বরুণ নিকেতন" হইতে "ক্ষীরোদ সমুদ্র" অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নালন্দার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে সুমাত্রা ও যবদ্বীপের রাজা শৈলেন্দ্র বংশীয় শ্রীবালপুত্রদেব দেবপালদেবের রাজ্যান্তর্গত বৌদ্ধ তীর্থ নালন্দায় একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তৎকর্ত্তৃক দেবপালদেব অনুরুদ্ধ হইয়া রাজগৃহ বিষয়ে পাঁচ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন

খানির দূতক ছিলেন ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের অধিপতি শ্রীবল বর্ম্মা। দেবপালদেব আফগানিস্থানের অন্তর্গত নিংরাহার নগরের ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সজ্ঘস্থবির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভট্টগুরব মিশ্রের শিলাস্তম্ভলিপিতে দেবপালদেবের বিস্তৃত রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। (জয়পুরহাট স্টেশন দ্রষ্টব্য।) দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আন্দাজ ৮৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। দেবপালদেবের পর প্রথম শূরপাল বা প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এই পাঁচজন রাজার সময়ে প্রথমে গুর্জ্জররাজ ভোজদেব ও মহেন্দ্রপাল এবং পরে হিমালয়ের কম্বোজ জাতির নিকট পাল রাজত্ব বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং শেষোক্ত রাজার সময়ে পালবংশীয় রাজগণ কম্বোজ জাতি কর্তৃক গৌড় দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র প্রথম মহীপাল রাঢ়ে বা সমতটে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং শীঘ্রই গৌড় মগধ, তিরহুত (মিথিলা) ও বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে উত্তরাপথের কেকল্লবংশীয় গাঙ্গেয় ও তৎ পুত্র কর্ণদেব ও দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল ও চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় জয়সিংহ ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল প্রতাপে রাজ্যজয় ও বিস্তারে ব্যস্ত থাকিলেও মহীপালদেব যে পিতৃরাজ্যের অনেকাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার শক্তির সম্যক পরিচায়ক। দিনাজপুরের নিকটস্থ বাণগড়ে মহীপালদেবের এক খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম মহীপালদেব ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন এবং সারনাথে বহু মন্দির ও চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন ও "অষ্টমহাস্থান শৈল-গন্ধকূটী" পুনর্নিম্মিত করাইয়া ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে, আন্দাজ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের একটি প্রসিদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহাতে তিব্বত হইতে ভিক্ষুরাও যোগ দিয়াছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে প্রথম মহীপালদেবের খ্যাতির কথা পল্লী গাথা ও গীতিতে বাংলার নানা স্থানে কিছুকাল পূর্ব্বেও শ্রুত হইত; কোচবিহার ও ওড়িষ্যার স্থানে স্থানে এখনও তাহার রেশ পাওয়া যায়। প্রথম মহীপালদেব প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া (৯৮৮-১০৩৬ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র নয়পালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার সময়ে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সজ্ঘস্থবির শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশ তিব্বত রাজ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মে নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করেন। নয়পালদেবের পাকশালার অধ্যক্ষ চক্রপাণি দত্ত চরক ও সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। নয়পালদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। চেদীরাজ কর্ণদেব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন এবং তাঁহার সহিত কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন, কিন্তু কল্যাণরাজ চালুক্যবংশীয় আহবমল্ল গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় হইতেই দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী হওয়ায় ক্ষৌণীনায়ক দিব্যক কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। [সান্তাহার দ্রষ্টব্য]। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের পর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল পর পর "গৌড়াধিপতি" বলিয়া ঘোষিত হন।

"রামপালের অভিষেক কালে পাল-রাজগণের অধিকার বোধ হয় ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত 'ব' দ্বীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।" বরেন্দ্র ভূমি ও গৌড় সিংহাসন তখন দিব্যকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের অধিকারে ছিল। রামপাল পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করিবার জন্য সামন্তরাজগণের সাহায্য লইয়া নৌ সেতু দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়া ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। রামপাল ওড়িষ্যা, কামরূপ ও মিথিলা জয় করেন। রামপাল রমাবতী নামে একটি নূতন রাজধানী ও জগদ্দল নামে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রামপালদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" গ্রন্থে পালবংশীয়দের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ লিখিয়াছেন, রামপালদেব ৪৬ বৎসর গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামপালের পর তাঁহার পুত্র কুমারপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার অল্পকাল রাজত্ব মধ্যেই ওড়িষ্যারাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ভাগীরথী তীরবর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করেন এবং কর্ণাট দেশীয় চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয়সেন রাঢ় অধিকার করেন। কুমারপালদেবের পর তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় গোপালদেব অল্পকালের জন্য রাজা হইয়া সম্ভবতঃ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন এবং রামপাল দেবের কনিষ্ঠপুত্র মদনপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার রাজ্য মগধ ও উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। মদনপালদেব তাঁহার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনিই সম্ভবতঃ পাল বংশের শেষ রাজা। ইহার পর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মগধের পূর্ব্ব ভাগে গোবিন্দপাল নামে এক রাজা ছিলেন; অনেকে অনুমান করেন ইনি পালবংশীয়। ইনি মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের সহিত যুদ্ধ করিয়া সসৈন্যে নিহত হন। এ যুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দেশ রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বিজেতৃগণ জয়ী হইয়া উদ্দণ্ডপুর সঙ্ঘারাম ও বিক্রমশিলা মহাবিহারের রাশি রাশি গ্রন্থ ভস্মীভূত করিয়াছিল। প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া রাজত্ব করিবার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এই বাঙালী রাজবংশ লুপ্ত হইয়া যায়। পাল রাজগণের ইতিহাস বাঙালী জাতি ও বাংলা দেশের ইতিহাস। তাঁহাদের সময়ে জাতীয় জীবনে নানা দিকে উন্নতি দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের রাজত্ব কালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্প সাধনার চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়; গৌড় ও মগধ তখন ভাস্কর্য্যের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহাদের সময়ে দুই জন বিশিষ্ট ভাস্কর ধীমান ও বীটপালের কথা তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। পাল যুগের অনুপম মূর্ত্তি প্রভৃতিগুলি এই শিল্পিদ্বয় এবং তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পাল রাজগণের রাজধানী প্রাচীন গৌড়ের চিহ্নমাত্র নাই। বর্ত্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের কয়েক মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীর নিকটে এই রাজধানী অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রাসাদাদির উপকরণ লইয়া পরবর্ত্তী সেন ও পাঠান রাজগণের রাজধানী নির্ম্মিত হয়। তাঁহাদের কীর্ত্তিগুলি এখনও গৌড়ের ভগ্ন প্রাসাদ ও মস্‌জিদের অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণাটদেশীয় সেনবংশজ বিজয় সেনের গৌড় বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজশাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপি প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে বিজয় সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপরাজ ও কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। (খেতুর রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য।) প্রায় ৩৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক বল্লাল সেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লাল সেন কৃত 'দান সাগর" ও "অদ্ভুত সাগর" নামক স্মৃতি ও জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১১৩ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। চালুক্য বংশসম্ভূতা তাঁহার মাতার নাম রামদেবী। লক্ষ্মণ-সেনদেবের পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেন বারাণসী, প্রয়াগ, কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে মগধের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। ইঁহার সময়ে সেনবংশ উন্নতির চরমশীর্ষে উন্নীত হয়। ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। রামপাল দেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয় ভাস্করশিল্পের পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ীয় শিল্প উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শনগুলি প্রথম পাল সাম্রাজ্যের শিল্প নিদর্শনসমূহের সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেকের সময় হইতে লক্ষ্মণ সংবৎ বা লসং নামে একটি নূতন অব্দ গণনা করা হয়। বুদ্ধগয়ার দু'খানি শিলালিপিতে লসং ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অব্দ সেন রাজ্যের অন্তর্গত মিথিলায় বহুকাল প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক কালেও কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রদ্বয় গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পর ও ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সেন রাজগণের রাজত্বকালের সামান্য চিহ্নই গৌড়ে এখন দৃষ্ট হয়। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে বল্লালসেন গৌড়ে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাদুল্লাপুরে এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও সুবৃহৎ মৃৎপ্রাকার দেখা যায়; ইহা বল্লালবাড়ী বা বল্লালভিটা নামে অভিহিত। বল্লালের প্রতিষ্ঠিত বিশাল বড় সাগরদীঘিও এই স্থানে বর্ত্তমান। এত বড় জলাশয় বাংলাদেশে আর নাই বলিলেই হয়। দৈর্ঘ্যে ইহা ৪৮০০ ফুট প্রস্থে ২৪০০ ফুট। সাগরদীঘির উত্তর-দক্ষিণে এক মাইল দূরে গঙ্গার একটি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত খাতে সাদুল্লাপুরের গঙ্গাস্নানের ঘাট অবস্থিত। কথিত আছে, কোন কোন মুসলমান সুলতানের আমলে এই একটি মাত্র ঘাটে হিন্দুরা স্নান আহ্নিকাদি করিতে পারিতেন। পৌষ সংক্রান্তি, ভাদ্র পূর্ণিমা, ভাদ্র সংক্রান্তি ও দশহরায় বহুকাল হইতে এই স্থানে মেলা বসে। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া রাজধানীর উত্তরস্থ শহরতলীতে দুর্গ ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্থানের নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে লখনৌতী বলিতেন। বর্ত্তমান মালদহ বা ইংরেজ বাজারের নিকটে রাজমহল রাস্তার উপর একটি উচ্চভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত স্থানে লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদাদি ছিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজী সেন রাজগণের নিকট হইতে গৌড় ও রাঢ় জয় করেন। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ বর্ণিত ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নোদিয়া নগর অধিকার ও রাজা লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন কাহিনী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেন না, কারণ তৎকালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন না এবং অর্দ্ধ শতাব্দী পরে গৌড়রাজ মুগীস্‌-উদ্দীন য়ুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া সেই ঘটনা স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা বাহির করেন। কোন্‌ সময়ে কিরূপে মুসলমানগণ গৌড় জয় করিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞাত। বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় অধিকারের পর প্রায় ১২৫ বৎসরকাল সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। পাঞ্জাবের উত্তর ও পূর্ব্বস্থিত হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী ও জুঙ্গার পার্ব্বত্য রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতিগণ বাংলার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজবংশের কুল পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রমাব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রয়াগে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রূপসেন পাঞ্জাবে গমন করিয়া রূপর নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং ক্রমে ক্রমে মণ্ডী, সুকেত প্রভৃতি রাজ্য এই বংশের অধিকারে আসে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী তিব্বত অভিযান হইতে ফিরিবার পথে দেবকোটে পরলোক গমন করিলে তাঁহার সহকারীদের মধ্যে প্রথম আলিমর্দ্দন ও পরে গিয়াস উদ্দীন দিল্লীর অধীনে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২১১ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং বীরভূমের রাজনগর হইতে গৌড়ের মধ্য দিয়া দিনাজপুরের দেবকোট পর্য্যন্ত একটি রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করেন। ইনি ঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর পর কয়েকজন সুলতান দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। সম্রাট শমস্‌-উদ্দীন আলতমাশের এক পুত্র নাসির-উদ্দীন গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১২৩৭ খৃষ্টাব্দের সুলতানা রিজিয়ার মুদ্রায় প্রথম লখ্‌নৌতী টাঁকশালের নাম দৃষ্ট হয়। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াস্‌-উদ্দীন বলবনের সময়ে তুগ্রল খাঁ মুগীস্‌-উদ্দীন উপাধি লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্রাট তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন। তুগ্রল পরাজিত ও নিহত হন এবং সম্রাট বিদ্রোহীদিগকে দলে দলে ফাঁসী দিয়া এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে কিছুকাল আর বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। সম্রাট পুত্র নাসির-উদ্দীন বগ্‌ড়া খাঁ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

পরে আবার গৌড়ীয় সুলতানগণ সুবিধা পাইলেই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিতেন। গৌড়রাজ ফকর-উদ্দীন মবারক শাহ, ইখতিয়ার-উদ্দীন গাজী শাহ, আলাউদ্দীন আলি শাহ ও শম্‌স্‌-উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ নিজ নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়া দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ-বিন-তোগলক শাহের রাজত্বের শেষ দিকে গৌড়ের স্বাধীনতার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন। এ সময়ে গৌড়বঙ্গ যখন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, মগধ বা বিহার দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা মানিয়া চলিত। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে শম্‌স্‌-উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পুরাতন গৌড়ের ২০ মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়া নগরীতে রাজধানী

স্থানান্তরিত করেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ-বিন্-তোগলক শাহ তাঁহার প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে এই সময়ে দামনাশের শিখিবাহন বা শিখাই সান্যাল এবং ভাজনীর সুবুদ্ধিরায় ভাদুড়ী প্রভৃতি হিন্দুদিগের মধ্য হইতে ৫০ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া শম্‌স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের বিরাট সেনাবাহিনী গঠনে ও অন্যান্য নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। শম্‌স্-উদ্দীন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ শিখাই সান্যালকে প্রসিদ্ধ চলনবিলের দক্ষিণাংশ ও ভাদুড়ীদিগকে উত্তরাংশের জমিদারী প্রদান করেন। শিখাই সান্যালের গড়বেষ্টিত বাসভবন সান্যালগড় বা সাঁতোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী গৌড়ের সুলতানকে বার্ষিক মাত্র এক টাকা কর দিতেন; এজন্য ইঁহার বংশ "একটাকিয়া" ভাদুড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দিল্লীশ্বর মহম্মদ-বিন্-তোগলকের পর তৎপুত্র সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক বাংলাকে দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর শম্‌স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ নিজ রাজধানীতে সম্রাট শম্‌স্-উদ্দীন আলতমাশ নির্ম্মিত দিল্লীর প্রসিদ্ধ স্নানাগারের অনুকরণে একটি স্নানাগার নির্ম্মাণ করায় সম্রাট ফিরোজ শাহ্ তোগলক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া বাংলা স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল, এইবার সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক স্বয়ং ৭০ হাজার সৈন্য সহ গৌড়াভিযানে বাহির হন। শম্‌স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ার ২০ মাইল উত্তরে নদী ও অরণ্যবেষ্টিত একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফিরোজ শাহ তোগলক পাণ্ডুয়া বিনা আয়াসেই অধিকার করিলেন, রাজধানীর নিরীহ অধিবাসীদের উপর তিনি কোনও অত্যাচার করেন নাই। নিজ নামানুসারে তিনি পাণ্ডুয়ার ফিরোজাবাদ নামকরণ করেন। একডালা দুর্গ ২২ দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়াও সম্রাট-পক্ষ ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সম্মুখে বর্ষার ভয়ে সম্রাটপক্ষ অধিক দিন অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া কৌশলে গৌড়ীয়গণকে দুর্গ হইতে বাহির করিবার জন্য অবরোধ উঠাইয়া কিছুদূর হটিয়া গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং রটাইয়া দিলেন যে তাঁহারা দিল্লী ফিরিয়া যাইতেছেন। ইসিয়াস্ শাহ শত্রুপক্ষকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য ১০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক ও ৫০টি হাতী লইয়া অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে সম্রাটপক্ষীয়গণ দক্ষিণে বামে ও মধ্যে ৩০ হাজার করিয়া অশ্বারোহী ও হস্তিদল রাখিয়া প্রচণ্ডবেগে সহসা ইলিয়াস্ শাহের পক্ষকে আক্রমণ করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে সহদেব নামে একজন বাঙালী সেনাপতি গৌড়রাজের পক্ষে বীরত্বের সহিত লড়িয়া এক লক্ষ আশি হাজার বাঙালী সৈন্যসহ নিহত হন। ইহা একডালার যুদ্ধ নামে খ্যাত। ইলিয়াস্ শাহ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন তিনি প্রতারিত হইয়াছেন এবং রণে ভঙ্গ দিয়া পুনর্ব্বার দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক দ্বিতীয় বার দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু এবারেও কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না এবং শেষ অবধি সদলবলে দিল্লী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মান জনক সন্ধি স্থাপিত ও গৌড় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তখন হইতে বাংলার স্বাধীনতা দিল্লীর বাদশাহগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়। অতঃপর শম্‌স্-উদ্দীন ইলিয়াস শাহ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন;

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ফখর-উদ্দীন মবারক শাহ যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁহার আত্মীয় ও অনুচরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন; কেবল জামাতা জাফর খাঁ সমুদ্রপথে পলাইয়া সিন্ধু প্রদেশে তত্তায় উপস্থিত হন এবং তথা হইতে দিল্লী গিয়া বাদশাহ ফিরোজ শাহ তোগলকের অনুগ্রহ লাভ করিয়া উজীর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরামর্শে ও প্ররোচনায় বাদশাহ দ্বিতীয় বার ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ৪৭০টি হস্তী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য লইয়া গৌড় আক্রমণে যাত্রা করেন। পথে জৌনপুরে ৬ মাস অবস্থান করিয়া গৌড়ে আসিতে আসিতে সুলতান শমস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দর শাহ গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ অনুসারে সিকন্দর শাহ শমস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহের হিন্দু মহিষী ফুলমতী বেগমের পুত্র। ফিরোজ শাহ তোগলক আসিয়া পৌছিলে সিকন্দর শাহ পিতার ন্যায় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহী সেনা তৃতীয় বার একডালা দুর্গ অবরোধ করে। এবারও দুর্গ অজেয় রহিল। অবশেষে সন্ধির কথাবার্ত্তা সুরু হইল; বাদশাহের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রনীতিকুশল হয়বৎ খাঁ নামক একজন বাঙালী গৌড় রাজ সিকন্দর শাহের নিকট দূত হইয়া গিয়া সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্রাট ফিরোজ শাহের প্রস্তাব মত স্থির হয়, সিকন্দর শাহ জাফর খাঁকে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গ ফিরাইয়া দিবেন এবং সম্রাট দিল্লী ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু জাফর খাঁ শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই, কারণ তথায় তাঁহার কোনও বন্ধু বা অনুচর ছিল না। তখন হইতে সিকন্দর শাহ ও তাঁহার বংশীয়গণ গৌড় ও পূর্ব্ববঙ্গ সমগ্র রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক দিল্লী ফিরিয়া যাইবার পর প্রায় দুই শতাব্দী কাল বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের দিল্লীর বাদশাহের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সুলতান সিকন্দর শাহ পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (আদিনা স্টেশন দ্রষ্টব্য।) সিকন্দর শাহ বাংলা দেশ জরীপ করিয়া রাজস্ব নির্ণয় করেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত গজকাটি সিকন্দরী গজ নামে আজিও পরিচিত। তিনি নিজে দীর্ঘকায় পুরুষ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য সিকন্দর চৌহাতা ও পীর নামে অভিহিত হইতেন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সহিত যুদ্ধে সিকন্দর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। কথিত আছে শমস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তৎপুত্র সিকন্দর শাহের ফৌজদার কংসরামের বজ্রবাহু জনার্দ্দন নামে এক বীর পুত্র ছিলেন। নানা যুদ্ধে তিনি সাহসিকতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের মধ্যে যুদ্ধ হইলে তিনি আরাকান রাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে আরাকান রাজকন্যা মৌসংকে বিবাহ করিয়া সিংহলে গমন করেন এবং সেখানকার রাজা হন; এই কাহিনী অনুসারে বিজয় সিংহের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে আর একজন বাঙালী সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন।

গিয়াস-উদ্দীন আজম্ শাহ্ ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন। কথিত আছে একদিন শিকারকালে গিয়াস-উদ্দীনের নিক্ষিপ্ত একটি তীর দৈবক্রমে একটি বালককে নিহত করে। বালকের অসহায়া বিধবা মাতা কাজী সিরাজ-উদ্দীনের নিকট বিচার প্রার্থনা করিলে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুলতানকে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কাজী সাহেব একজন হরকরা প্রেরণ করিলেন। হরকরা সুলতান সমক্ষে যাইতে সাহস

না পাইয়া অসময়ে আজান দিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে। অসময়ে আজান দিবার কারণ জানিতে চাহিলে হরকরা সুলতানকে কাজীর আদেশ নিবেদন করে। সুলতান গিয়াস-উদ্দীন বস্ত্রের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকাইয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী সাহেব বস্ত্র মধ্যে একটি চাবুক লুকাইয়া রাখিয়া সুলতানকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং বিচারে তাঁহাকে উচিত পরিমাণ অর্থ দিয়া বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দিলেন। সুলতান সানন্দে তাহা পালন করিলেন এবং তলোয়ারটি বাহির করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পদমর্য্যাদার ভয়ে কাজী যদি সুবিচার না করিতেন তাহা হইলে কাজীর মস্তক ছেদন করিতেন। কাজীও চাবুক বাহির করিয়া বলিলেন, সুলতান যদি বিচারালয়ের আদেশ না মানিতেন, এই চাবুকের দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দীর্ণ করিতেন। গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহ ইরাণের প্রসিদ্ধ কবি হাফেজকে নিজ রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন; কবি অবশ্য আসিতে পারেন নাই। কথিত আছে, একবার অত্যন্ত পীড়িত হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তিনি সর্ব্ব, গুল ও লালা নামে তিন জন অবরোধবাসিনীকে মৃত্যুর পর তাঁহার শব ধুইবার ভার দিয়াছিলেন, ইহা লইয়া তাঁহাদের সকলে বিদ্রূপ করিলে গিয়াস উদ্দীন একটি কবিতার প্রথমাংশ রচনা করেন; বাংলা তথা হিন্দুস্থানে কেহ ইহার শেষাংশ রচনা করিতে না পারিলে তিনি সিরাজ নগরে কবি হাফেজের নিকট উহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাফেজ অবিলম্বে উহা পূরণ করিয়া তাহার সহিত সুলতানের নামে একটি গজল লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।

গিয়াস্-উদ্দীন আজম শাহের রাজত্বের শেষদিকে ভাতুড়িয়া পরগণার হিন্দু জমিদার ও গৌড়ের রাজস্ব ও শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। রিয়াজ-উস-সলাতীন অনুসারে তাঁহার আদেশে বা চক্রান্তে গিয়াস-উদ্দীন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র নিহত হইলে গণেশ পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের গৌড় সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর পর অন্তর্যুদ্ধে গৌড় রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইলে গণেশ স্বয়ং রাজা হইয়া শান্তি ও সুশাসন স্থাপন করেন। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র মতে গণেশ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কায়স্থ কুলপঞ্জিকায় তাঁহাকে কায়স্থ ও দিনাজপুর রাজবংশের আত্মীয় বলা হইয়াছে। রিয়াজ-উস্-সলাতীন অনুসারে মুসলমানগণের প্রতি রাজা গণেশের অত্যাচারের জন্য পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ পীর সেখনূর কুতব্-উল্-আলম্ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ শার্কীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইব্রাহিম শাহ সসৈন্যে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলে রাজা গণেশ শেখনূর কুতব-উল-আলমের শরণাপন্ন হন এবং নিজ পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে স্বীকৃত হইলে শেখনূর কুতব-উল-আলমের কথায় জৌনপুরের সুলতান ফিরিয়া যান। যদু মুসলমান হইয়া জলাল-উদ্দীন নাম গ্রহণ করেন; রিয়াজ-উস্-সলাতীন অনুসারে গণেশ সুবর্ণধেনু ব্রত করিয়া জলাল-উদ্দীনকে পুনরায় হিন্দু করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গণেশের মৃত্যুর পর পুনরায় মুসলমান হন। রিয়াজ-উস্-সলাতীনে গণেশের কেবল নিন্দাই আছে, সেজন্য ঐতিহাসিকেরা রিয়াজের পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ সর্ব্বথা গ্রহণ করেন না। তারিখ-ই-ফেরেশতায় ইব্রাহিম শাহ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণের কোন উল্লেখই নাই এবং গণেশের বহু প্রশংসা আছে। গণেশ মুসলমানদিগকে বিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর রাজধানীর বহু মুসলমান তাঁহার শব মুসলমানের ন্যায়

সমাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া অনুমান ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাজা গণেশ একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার সময় হইতে গৌড়বঙ্গে পুনরায় সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং বাংলা ভাষারও উন্নতির সূত্রপাত হয়।

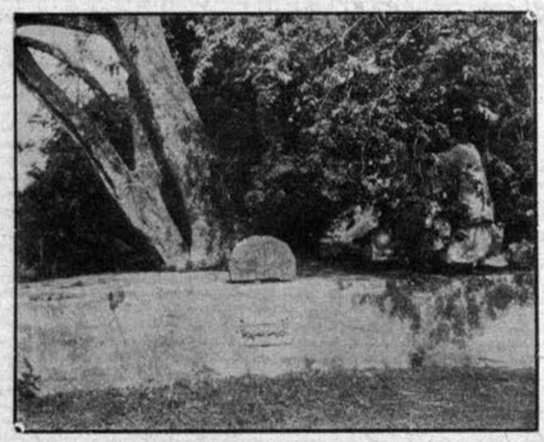
রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যদু জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ্ নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবকাৎ-ই-আক্‌বরী অনুসারে যদু রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়াছিলেন। আবার প্রবাদ অনুসারে প্রাক্তন মুসলমান সুলতান বংশের কোন কুমারীর প্রেম মুগ্ধ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম আসমানতারা, মতান্তরে ফুলজানি বেগম। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ ফিরোজাবাদ টাঁকশালে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কিত করিতে থাকেন। জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কায়স্থবংশীয় দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুয়া হইতে জলাল-উদ্দীনকে বিতাড়িত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আদিনা মস্‌জিদের ৩।৪ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে দনুজমর্দ্দন দেবের একটি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার কথা "কলিকাতা-খুলনা-বাগেরহাট" অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই দনুজমর্দ্দনদেবের মৃত্যুর পর জলাল-উদ্দীন পুনরায় সমগ্র গৌড়বঙ্গ অধিকার করেন; চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তাঁহার আধিপত্য সুদূর চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে রাজধানী পাণ্ডুয়ার গৌরব ও সৌন্দর্য্য বহুরূপে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল এবং ইহা সুবিস্তৃত জনবহুল নগরীতে পরিণত হইয়াছিল এবং গৌড়ও পুনরায় সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সতের বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শামস্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ একলাখী সমাধি মন্দিরে জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ, তাঁহার পত্নী ও পুত্র শামস্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহকে সমাহিত করা হয়। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যে সুলতান জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের পত্নী আসমানতারা পুত্র সুলতান শামস্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর গণেশ বংশীয় মুসলমান শাখা লুপ্ত হইলে শ্বশুরের ভিটা ভাতুড়িয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং হিন্দু বিধবাদের মত কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন। সুলতান শামস্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহকে হত্যা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুলতান শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশীয় নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি রাজধানী পুনরায় গৌড়ে ফিরাইয়া লইয়া যান। গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ কোতওয়ালী দরওয়াজা নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকন্ উদ্দীন বারবক্ শাহ্ ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় হইতে প্রাসাদ রক্ষায় হাবশী ক্রীতদাস নিযুক্ত হয়। আরবদেশীয় ইসমাইল গাজী নামক ইহার সেনাপতি গৌড়ের উত্তরে ছুটিয়াপটিয়া নামক একটি জলাভূমি বা নদীর উপর বহু আয়াসে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হন। ইসমাইল গাজী ওড়িষ্যা ও কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হুগলী জেলার অন্তর্গত মন্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে ইসমাইল গাজী তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং পরে ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে বারবক শাহের আদেশক্রমে নিহত হন। তাঁহার দেহ হুগলী জেলার মন্দারণে এবং মস্তক রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার গ্রামে সমাহিত আছে। রুকন্-উদ্দীন বারবক্ শাহের রাজত্বকালে গৌড়ে শান্তি

ও সমৃদ্ধি ছিল। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শমস্-উদ্দীন ইউসফ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সময়ে শ্রীহট্ট বিজিত হয়। তাঁহার নামের শিলালিপি শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজ্য বিজিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ে সুলতানদিগের হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং রাজ অনুগ্রহে প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। এই হাব্‌শী প্রীতি হইতে ইলিয়াস শাহের বংশের পতন হয়। এই বংশের শেষ রাজা জলালউদ্দীন ফতে শাহ্‌কে নিহত করিয়া হাব্‌শী ক্রীতদাস বারবগ সিংহাসন অধিকার করিলে জলালউদ্দীনের অনুরক্ত হাব্‌শী কর্ম্মচারী মালিক আদিল বারবগকে হত্যা করিয়া নিহত রাজার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু জলালউদ্দীন ফতে শাহের পত্নী বলেন তাঁহার পুত্র সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কোন যোগ্য ব্যক্তি রাজ্য শাসন করিবেন। তখন উজীর খাঁজাহান কর্ত্তৃক আহূত মন্ত্রণা সভায় রাজ্যের প্রধানগণ মিলিত হইয়া মালিক আদিলকে অনুরোধ করিলে তিনি সৈফউদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম লইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সুলতান সৈফউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ ন্যায়নিষ্ঠ ও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। গৌড়ের ফিরোজ মিনার ইনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসনে উঠিয়া ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ইহার পর কিছু কাল ধরিয়া গৌড় সিংহাসনের অবস্থা অনিশ্চিত ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রিয়াজ-উস-সলাতীন এ সময়ের কথা লিখিয়াছেন যে, যে রাজাকে যে হত্যা করিত সেই রাজা বলিয়া সম্মানিত হইত। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফরিয়া-দ-সৌজা বলিয়াছেন গৌড়ে পুত্র পিতৃ-সিংহাসন পায় না, প্রভু-হত্যাকারী ক্রীতদাসই সিংহাসনের অধিকারী হয়। তারিখ-ই-ফেরেস্তা বিদ্রূপ করিয়াছেন যে প্রভুকে হত্যা না করিলে কেহ গৌড় সিংহাসনের অধিকারী হয় না।

ইহার পর ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হাব্‌শী রাজাদের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইলে সুলতান শমস্‌উদ্দীন মজাফার শাহ নিহত হন এবং রাজ্যের প্রধানগণ কর্ত্তৃক আলাউদ্দীন হুসেন শাহ রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি আরব দেশ হইতে আগত ও সৈয়দ-বংশীয় ছিলেন। হুসেন শাহের রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত পালরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গোপালদেবের নির্ব্বাচনের বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, হুসেন শাহ সিংহাসন আরোহণ করিলে তাঁহার সৈন্যগণ গৌড় লুণ্ঠন করে; এই অপরাধে তিনি বার হাজার সৈন্যের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। হুসেন শাহ রাজা হইয়াই হাব্‌শী ক্রীতদাসগণকে দূর করেন এবং পুরাতন বনিয়াদী আফগান ও হিন্দুগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। বসু বংশীয় পুরন্দর খাঁ তাঁহার উজীর ছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রধান রূপ ও সনাতন প্রথম জীবনে হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সনাতন তাঁহার "দবীরখাস" (প্রাইভেট সেক্রেটারী) ও রূপ "সাকর মল্লিক" বা রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাদের ভ্রাতা অনুপ টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। অনুপের পুত্র জীবগোস্বামী পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ওড়িষ্যা, আসাম ও বিহার অধিকার করেন। দিল্লীর সম্রাট

সেকন্দর লোদী হুসেন শাহের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার পর হুসেন শাহ ত্রিপুরা রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহারাজ ধন্যমাণিক্যের বীর সেনাপতি চয়চাগের নিকট তাঁহার সেনাপতি বার বার তিনটি অভিযানে পরাজিত হন ; চতুর্থবার সেনাপতি গৌর মল্লিকের সহযোগিতায় স্বয়ং আক্রমণ করিয়া ত্রিপুরারাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (আসাম বাংলা রেলপথের আগরতলা স্টেশন দ্রষ্টব্য।) হুসেন শাহের রাজত্ব কালে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বহুরূপে গৌড়ের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়া ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে হুসেনশাহ পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাবর দিল্লীর



শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থল, রামকেলি

সিংহাসন অধিকার করিলে বহু সম্ভ্রান্ত আফগান গৌড়রাজ্যে আসিয়া নসরৎশাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাবর জৌনপুর জয় করিয়া বাংলা জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা হইতে আফগানগণ লাক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিলে তিনি নসরৎশাহের সহিত সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। নাসিরউদ্দীন নসরৎশাহের রাজ্যকালে গৌড়ের বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ, দাখিল বা দখল দরওয়াজা, কদমরসুল ও আলাউদ্দীন হুসেনশাহের সমাধি মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। হুসেনশাহের সমাধির ভিত্তি মাত্রই এখন অবশিষ্ট।

গৌড়রাজ আলাউদ্দীন হুসেনশাহ ও তৎপুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎশাহের সাহায্যে ও উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হুসেনশাহ "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" গ্রন্থের রচয়িতা মালাধর বসুকে "গুণরাজখাঁ" উপাধি দান করেন। (পূর্ব্বভারত রেলপথের জৌগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য)। ইহারই সময়ে ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে বিজয় গুপ্তের ও ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে

বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গল" রচিত হয়। বিপ্রদাস গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিয়াছেন "নৃপতি হুসেনশা গৌড়ে সুলক্ষণ" বিজয় গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ" গ্রন্থে হুসেনশাহের গুণাবলীর উল্লেখ আছে। হুসেনশাহের পুত্র নসরৎশাহ "ভারত পাঞ্চালী" নামে মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরৎখান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

হুসেন শাহ পুত্র নসরৎ শাহকে সেনাপতি পরাগল খাঁর সহিত চট্টগ্রামে মগদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই পরাগলখাঁর আদেশে চট্টগ্রামের সুপণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করেন ; এই মহাভারত "পরাগলী মহাভারত" নামে খ্যাত। পরাগলখাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চলে হুসেনশাহের সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার আদেশে চট্টগ্রামের শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব অনুবাদ করেন। হুসেনশাহ ও নসরৎশাহের নিকট বাংলা সাহিত্য বিশেষ ঋণী। কৃতজ্ঞ বাঙালী কবি তাঁহাদিগকে পদাবলীতে পর্য্যন্ত স্থান দিয়া সম্মান করিয়াছেন ; ইহা কম গৌরবের কথা নয়। যথা

"শ্রীযুতহসন জগতভূষণ, সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশরাজ খান॥"
"সে যে নসিরা শাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥"

(দীনেশচন্দ্র সেন কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য")

১৫৩২ খৃষ্টাব্দে নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ তিন মাসকাল রাজত্ব করিয়া পিতৃব্য গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহ কর্তৃক নিহত হন। গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ শের শাহ অত্যন্ত প্রবল হন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তাঁহার সৈন্যগণ গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠন করে। মহমুদ শাহ সম্রাট হুমায়ুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন সসৈন্যে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন, পথে মহমুদ শাহ তাঁহার সহিত মিলিত হন। ভাগলপুরের নিকট কহল্গাঁও গ্রামে পৌঁছিলে সংবাদ আসে মহমুদ শাহের বন্দী পুত্রদ্বয় গৌড়ে নিহত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শোকে অভিভূত হইয়া কহলগাঁওয়ে প্রাণত্যাগ করেন। গৌড়ের জান্ জান্ মিয়ার মস্জিদ গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহ কর্তৃক ১৫৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। মহমুদ শাহের মৃত্যুর পর ১৫৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন গৌড় নগর অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের "জন্নতাবাদ" বা স্বর্গপুরী এই নামকরণ করেন। শেরশাহ গৌড়ের লুণ্ঠিত সম্পত্তি রোতাস্ দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। গৌড়ে তিন মাস অবস্থান করিবার পর সৈন্যাদি অনেকে পীড়িত হইয়া পড়িলে হুমায়ুন আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় হুমায়ুন ছাপারঘাট নামক স্থানে শেরশাহের নিকট পরাজিত হন এবং গঙ্গায় পড়িয়া পলায়নকালে

একজন ভিস্তি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু তাঁহার পত্নী ৪ সহস্র মুঘল কুলবধূর সহিত বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। শেরশাহ মগধ ও গৌড় রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া ফরীদউদ্দীন মজঃফর শেরশাহ নাম গ্রহণ করিয়া গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে হুমায়ুনের সহিত তাঁহার পুনরায় যুদ্ধ হয় এবং হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং শেরশাহ তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ করেন।

শেরশাহের মৃত্যুর পর গৌড়ে তাঁহার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ স্থর ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরামৌএর যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার পুত্র গিয়াস্উদ্দীন বাহাদুর শাহ গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছু পরে মগধের সুলতান সুলেমান কররাণী গৌড়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি পুরাতন মালদহের সোনা মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন এবং গৌড়ের অস্বাস্থ্যকরতার জন্য গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে গৌড় ও রাজমহলের মধ্য পথে গঙ্গার চরে তাঁড়া নামক স্থানে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্ এবং তাঁহার পর অপর পুত্র দাউদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলেমান বা বায়াজিদ নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু দাউদ শাহ আরবী ও হিন্দি ভাষায় নিজ নামে মুদ্রা বাহির করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সম্রাট আকবরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা তোড়রমল্ল ও খান্খানান মুনম খাঁ তাঁহাকে দমন করিতে প্রেরিত হন। দাউদ ভীত হইয়া গৌড় পরিত্যাগ করেন। মুঘল সৈন্য বিনা বাধায় রাজধানী তাঁড়া অধিকার করে। ঐ সময়ে কোচরাজ নরনারায়ণ "গৌড়পাশা" দাউদ শাহের বিরুদ্ধে আকবর বাদশাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুঘলদল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে সপ্তগ্রাম হইতে হটাইয়া সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে একরোই বা মুঘলমারী গ্রামে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করে। দাউদ পরাজিত হইয়া কটকে পলায়ন করেন এবং তথায় আত্মসমর্পণ করিয়া ওড়িষ্যার জায়গীর পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে অনুমান হয় ম্যালেরিয়া মহামারীতে গৌড় নগরী শ্মশানে পরিণত হয়। এই বৎসর গৌড়ের মুঘল শাসনকর্ত্তা খান্খানান্ মুনিম খাঁ তাঁড়ায় দেহত্যাগ করিলে দাউদ নিজ রাজ্য পুনরাধিকারের চেষ্টা করেন। রাজমহলের নিকট দাউদ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক আকবরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে দাউদ শাহ গৌড়ের শেষ স্বাধীন রাজা। রাজা মানসিংহের সময় পর্য্যন্ত বাংলার সুবাদারগণ তাঁড়ায় অবস্থান করিতেন। আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহার ভ্রাতা শাহ্ সুজা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁড়ায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁড়ার কোনও চিহ্নমাত্র এখন নাই। ইহা নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়াছে। দাউদ শাহের মৃত্যুর পরও আফগান প্রধানগণ গৌড় ও মগধে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ আরও ৫০ বৎসর মুঘল আধিপত্য স্বীকার করে নাই।

প্রাচীন গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

ইংরেজ বাজার শহর হইতে দক্ষিণে যে পথ কানসাট অভিমুখে গিয়াছে, ঐ পথের তিন চারি মাইল অতিক্রম করিলেই গৌড় নগরীর সীমানা আরম্ভ হয়। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে তিন মাইল অতিক্রম করিলে সাদুল্লাপুরের প্রাচীন ভাগীরথীর **স্নানের ঘাট, বল্লালভিটা ও বড়সাগরদীঘি** পাওয়া যায়। ইহাদের কথা আগে বলা হইয়াছে। ইহাদের কাছেই দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির। বড়সাগরদীঘির ধারে মখ্‌দুমশেখ অখি সিরাজউদ্দীন নামক একজন সাধকের সমাধি আছে। সুলতান হুসেন শাহ নির্ম্মিত একটি ফটক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই হুসেন শাহের পুত্র ও নসরত শাহের অনুজ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মহমুদশাহ নির্ম্মিত **জান জান মিয়ার মসজিদ্‌**।

সাদুল্লাপুরের দিকে না গিয়া সোজা দক্ষিণে ইংরেজ বাজার হইতে ৭।৮ মাইল অতিক্রম করিলেই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন সমূহ একে একে নয়নগোচর হইতে থাকে।

ইংরেজ বাজার হইতে সাত-সাড়ে সাত মাইল দূরে পথিপার্শ্বে একটা ঘেরা স্থানের মধ্যে দুইটা প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুইটি সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। কেহ কেহ বলেন, ঐ দুইটিতে পূর্ব্বে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত এজন্য উহাদের নাম **শূলদণ্ড**।

এই স্তম্ভ দুইটি হইতে আরও কিছু (প্রায় এক মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে **পিয়াসবাড়ী** দীঘি অবস্থিত। সাধারণ লোক ইহাকে "পিয়াজবাড়ী" পুকুর বলিয়া থাকে। এই স্থানে উচ্চ ভূখণ্ডের উপর একটি ডাকবাংলা আছে। গৌড় দর্শনেচ্ছু যাত্রীরা ভাড়া দিয়া এই ডাকবাংলায় থাকিয়া ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গৌড় দর্শন করিতে পারেন। পিয়াস-বাড়ীতে সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি বিস্তীর্ণ রেশমের কারখানা আছে। আধুনিক হইলেও ইহা গৌড় যাত্রীর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। পূর্ব্বে পিয়াসবাড়ীতে একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা ছিল।

পিয়াসবাড়ী হইতে দক্ষিণদিকে যে রাস্তা গিয়াছে উহা দিয়া প্রায় আধ মাইল পথ গেলে **রামকেলি** গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গ্রামের প্রবেশ পথেই প্রসিদ্ধ রূপসনাতন-সেবিত মদনমোহনের ঠাকুরবাড়ী ও কেলি কদম্ব বৃক্ষ।

মদনমোহন মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে কেলি কদম্ব বৃক্ষ। একটি বেদীর মধ্যে চারিটি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইটি তমাল ও দুইটি কদম্ব। একটি তমাল বৃক্ষ অত্যন্ত বৃহৎ। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসিয়া ইহারই ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। বৃক্ষটির নিম্নে একখানি নাতিবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত আছে। উহার অঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন অঙ্কিত। শ্রীচৈতন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন রামকেলিতে এই বৃক্ষমূলে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদচিহ্ন, মদনমোহন বিগ্রহ, রূপসনাতনের বাসাবাড়ী, রূপ গোস্বামী খনিত রূপসাগর দীঘি এবং জীব গোস্বামী দ্বারা খনিত শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামক পুষ্করিণী আছে বলিয়া রামকেলি বৈষ্ণবের পরম পবিত্র তীর্থ। এই হেতু রামকেলির অপর নাম 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের

সংক্রান্তির দিন চৈতন্যদেবের আগমনের দিন স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সুবৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। রূপসাগর দীঘিটি বৃহৎ, কিন্তু কুণ্ডগুলি ক্ষুদ্র। এ সকল জলাশয়েই কুম্ভীর আছে।

রূপসাগরের নিকটে দক্ষিণ দিকে বড় সোনা মস্জিদ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা **বারদুয়ারী** নামেও প্রসিদ্ধ। ইহা ১৬৮ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া। বাদশাহদিগের দপ্তরখানারূপেও ইহা ব্যবহৃত হইত। ইহার এখন ধ্বংসাবস্থা, তথাপি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ ইহার যথাসাধ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মস্জিদটি চতুষ্কোণ, প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার একটি প্রকাণ্ড দালান বা হলঘর আছে, তাহাতে দুই সারি স্তম্ভ ছিল, এখন অনেকগুলিরই ভগ্নদশা। পূর্ব্বে হলঘরের উপরে ছাদ ও ইষ্টক নির্ম্মিত ৪৪টি গম্বুজ ছিল, খিলানের আকার দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। মস্জিদের উত্তরাংশে মহিলাদের বসিবার জন্য উচ্চ মঞ্চ এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই মস্জিদের সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি জলাশয় আছে, তাহাতে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। ঐতিহাসিকরা বলেন, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ এই মস্জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরৎশাহের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মস্জিদটি নসরৎশাহের সৌন্দর্য্য বোধ ও শিল্পানুরাগের সম্যক্ পরিচায়ক। রাভেন্‌শ ইহাকে গৌড়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বড় সোনা মস্জিদ বা বারদুয়ারী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে মুসলমান রাজাদিগের গৌড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই দিকে উক্ত দুর্গের উত্তরের দ্বার অবস্থিত। ইহাই দুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বার ছিল। উহার নাম **দাখিল-দরওয়াজা**।

এই দুর্গ ও প্রাসাদ এক মাইল বিস্তৃত ছিল। এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে ৮ ফুট চওড়া ও ৬৬ ফুট উচ্চ প্রস্তরমণ্ডিত ভীম প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীর ৬৬ ফুট বা ২২ গজ উচ্চ ছিল বলিয়া এখনও "**বাইশগজী**" নামে পরিচিত। এখন প্রাচীরের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে—প্রাচীর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীরের পাদমূলে যে গভীর পরিখা ছিল, উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, উহাতে সর্ষপাদির চাষ আবাদ হইতেছে।

দাখিল দরওয়াজাটি ৭০ ফুট উচ্চ। উহার মধ্য দিয়া তিনটি বৃহৎকায় হস্তী পর পর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। ছোট ছোট লাল ইটে তৈয়ারী দরওয়াজার প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ কারুকার্য্য দেখা যায়। দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রহরীদের থাকিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। এককালে এই প্রকাণ্ড দরওয়াজার দুই দিকে চারিটি ইষ্টকের মিনার ছিল।

উত্তর দিকের দাখিল দরওয়াজা দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর পর কয়টি প্রাচীন ধ্বংস-নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, যথা,—প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত 'হাবেলি খাস' রাজপ্রাসাদ, বাদসাহ কবর, কদম রসুল, চিকা মস্জিদ, গুমটি মস্জিদ ইত্যাদি।

দাখিল দরওয়াজার পর কিছুদূর অগ্রসর হইলে একে একে ধ্বংসাবশিষ্ট চাঁদ দরওয়াজা, নিম-দরওয়াজা, প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বাইশগজী প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার প্রাচীন খাত কোনরূপে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের প্রাচীন নাম **'হাবেলি খাস'**। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা স্থানে স্থানে শৈবালদল ও জঙ্গলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই প্রাসাদ পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের প্রাসাদ ছিল এবং তাঁহাদের আমলে ইহা অন্দরমহল ছিল। অন্দরমহলের পশ্চাতে পুষ্করিণী ও টাঁকশাল ছিল।



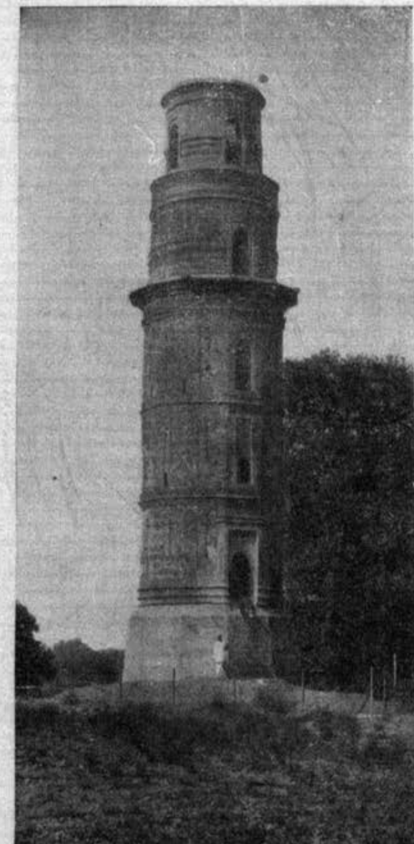
দাখিল দরওয়াজা, গৌড়

গৌড়ের ইতিহাস লেখকেরা গৌড়-প্রাসাদটিকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন—(১) উত্তরাংশে দরবার-গৃহ, (২) উহার দক্ষিণে অর্থাৎ মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ, (৩) সকলের দক্ষিণে হারেম অর্থাৎ বেগম মহল ছিল। এখন এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছাদিত।

রাজপ্রাসাদ যেখানে অবস্থিত ছিল, তাহার উত্তর-পূর্ব্বে সুলতান হুসেন শাহের বিশাল সমাধিস্থান আছে। ইহার নাম বাংলা কোট, কিন্তু ফ্রাঙ্ক্‌লিন উহাকে **বাদশা-কি-কবর** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ফ্রাঙ্ক্‌লিন বলেন, এই সমাধি স্থানের পাষাণ-দ্বার দেখিতে

অতি সুন্দর ছিল, উহার সম্মুখভাগ ও পার্শ্বদেশ শ্বেত ও নীল মীনার কাজ করা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ছিল; পরন্তু চারি কোণে চারিটি গোলাপ অঙ্কিত ছিল। এখন আর কবরের বা কবরের দ্বারের মীনার সুন্দর কাজ কিছুই দেখিবার উপায় নাই—কাল সবই গ্রাস করিয়াছে।

দাখিল দরওয়াজা হইতে এক মাইল দক্ষিণে **ফিরোজ মিনার** বা ফিরোজ শাহের 'ছড়ি' দ্রষ্টব্য পদার্থ। ইহা ৮৪ ফুট উচ্চ এবং নীচের দিকে ১২টি ভুজবিশিষ্ট বহুভুজ ও

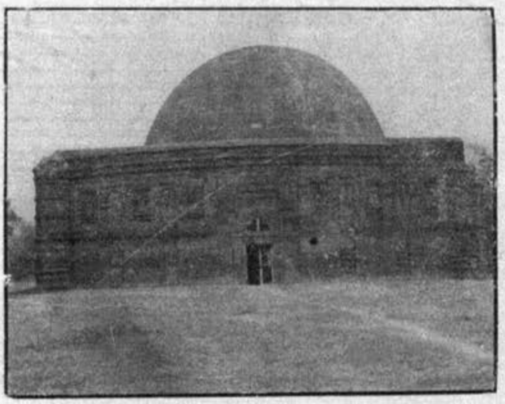


ফিরোজ মিনার, গৌড়

উপর দিকে বৃত্তাকার। ভিতরে ৭৩টি ধাপবিশিষ্ট ঘোরান সিঁড়ি আছে। পূর্ব্বে ইহার শীর্ষে একটি গম্বুজ ছিল। একখানি আরবী শিলালেখ অনুসারে বাংলার হাব্‌শী রাজা সৈইফ্-উদ্দিন ফিরোজ শাহ্ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় লোকে ইহাকে পীর-আশা-মিনার বা চিরাগদানীও বলিয়া থাকেন। শুনা যায় যে, ইহা একটা সঙ্কেতের আড্ডা স্থান ছিল। এই মিনারে আলোক জ্বালাইয়া মহানন্দাতটস্থ

নিমাসরাইএর মিনারের আলোকের সহিত গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করা হইত। মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমস্থলে শেষোক্ত মিনারটি অবস্থিত। ফিরোজ মিনার হইতে গৌড়ের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ও রাজমহলের গিরি শ্রেণীর ধূসর শোভা সত্যই সুন্দর মনে হয়।

ফিরোজ মিনার হইতে প্রায় একপোয়া পথ দক্ষিণে '**লুকোচুরি**' বা 'লক্ষছিপি' দরওয়াজা। ইহা গৌড় দুর্গের পূর্ব্ব দ্বার ছিল। দুর্গের উত্তর ও পূর্ব্ব দ্বারই বিদ্যমান, অন্য দুইটি দ্বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কানিংহাম বলেন, ১৫২২ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ এই দরওয়াজা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাদশাহ সাজাহানের পুত্র গৌড়ের সুবেদার শাহসুজা যখন কিছু দিনের জন্য গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তখন এই দরওয়াজার জীর্ণসংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ, বাদশাহ বেগমরা এই দরওয়াজায় লুকোচুরি খেলিতেন।



কদমরসুল মস্‌জিদ, গৌড়

এই লুকোচুরি দরওয়াজার পার্শ্ববর্ত্তী **কদম রসুল** নামক মসজিদ দেখিবার জিনিষ। মুসলমানদিগের নিকট ইহা অতি পবিত্র। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহ্ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। মস্‌জিদটির একটি গুম্বজ আছে ও চারিকোণে চারিটি মিনার আছে। মিনারগুলি কৃষ্ণপ্রস্তরের। মস্‌জিদের গর্ভগৃহে একটি বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্রায়তন বেদী আছে। উহার উপর কষ্টিপ্রস্তর নির্ম্মিত যুগল পদচিহ্ন আছে। কদম রসুল অর্থে পয়গম্বর মহম্মদের পদচিহ্ন (কদম = পদ + রসুল = পয়গম্বর)। মুসলমানরা এই পদচিহ্ন হজরত মহম্মদের বলিয়া পূজা করেন। মস্‌জিদের মধ্যস্থ কক্ষদ্বার কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও দেখিবার জিনিষ। উহা চারি শত বৎসরের পুরাতন। উহার তক্তার উপরে কাপড় মারিয়া পলস্তারা করা। এখনও সেই পলস্তারার কাজ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কক্ষ মধ্যে প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক আছে। কেহ কেহ বলেন, উহার মধ্যে 'কদম' আনা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন শয়তানকে উহার মধ্যে কিছুক্ষণ

আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ পদচিহ্নটি মক্কাশরীফ হইতে আনাইয়াছিলেন এবং উহা পাণ্ডুয়ার বড়দরগাহের চিল্লাখানায় রক্ষিত ছিল।

মস্‌জিদের সম্মুখভাগ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ঐ দিকে মস্‌জিদ গাত্রের ইষ্টকের উপর নক্সার কাজ অতি সুন্দর। উহার দ্বার-শীর্ষে ডোগরা অক্ষরে শিলালেখ আছে। কদম রসুলের পার্শ্বে বিষ্ণু মন্দিরের আকারে দোচালা কুঁড়ে ঘরের অনুকরণে নির্ম্মিত একটি সৌধের মধ্যে অনেকগুলি কবর আছে, তাহাদের মধ্যে সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্র ফতে খাঁর কবর উল্লেখযোগ্য।

কদম রসুলের মাত্র এক রশি দক্ষিণে প্রাচীর ভেদ করিয়া একটি গুপ্ত পথ আছে। ইহার পশ্চিমে প্রাকারগাত্রে **গুমটি দরওয়াজা** অবস্থিত। ইহার গাত্রে শ্বেত ও নীল মীনার কাজ করা ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে।

গুমটি দরওয়াজার পশ্চিমে **চিকা মস্‌জিদ** আর একটি দ্রষ্টব্য পদার্থ। ইহাকে 'চামখানা' বা 'চোরখানা'ও বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গুম্বজ বিশিষ্ট মস্‌জিদ। ইহারও দেওয়ালে শ্বেত ও নীল মীনার কাজ করা ইষ্টক শোভা পাইতেছে। ইহা মস্‌জিদ কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কানিংহাম বলেন, ইহা সমাধি মন্দির, এই স্থানে সুলতান জালাল উদ্দীনের পুত্র মহমুদ শাহের কবর আছে। চিকা মস্‌জিদটিকে দেখিলে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার শীর্ষদেশে একটি প্রকাণ্ড গুম্বজ আছে। ভিতরদিকে ইটের উপর মীনার কারুকার্য্য আছে। তলদেশ প্রস্তর-মণ্ডিত। এনামেল করা ইষ্টক দ্বারা প্রাচীর গাত্রের বাঁধন দেওয়া হইয়াছে। চিকা মস্‌জিদের চারি রশি পশ্চিমে "বাইশ গজী" অবস্থিত। চিকা মসজিদের সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ড সম্প্রতি খনিত হইয়াছে। উহা হইতে কয়েকটি সমাধিস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই প্রাঙ্গনটি যে পূর্ব্বে আগাগোড়া এনামেল ইট দিয়া বাঁধান ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

কদম রসুল হইতে অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে জিলা বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণে গেলে **তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ** পাওয়া যায়। এটিরও ভগ্নদশা। পূর্ব্বে ইহার স্তম্ভ ও গুম্বজ আদি সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। এক্ষণে ইহার ছাদ ও গুম্বজ নাই। কিন্তু অভ্যন্তরস্থ দেওয়ালের গাত্রে এবং কুলুঙ্গী বা মিহরাবে সুন্দর নক্সার কার্য্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে উমর কাজী কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত বলিয়া কথিত।

বাইশ গজী হইতে জিলা বোর্ড রাস্তায় পড়িয়া কিছু উত্তরে অগ্রসর হইলে **চামকাঠি মসজিদ** পাওয়া যায়। ইহা ইংরেজ বাজার হইতে নয় মাইল হইবে।

তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ হইতে অর্দ্ধ মাইল পথ দক্ষিণে অগ্রসর হইলে লোট্টন বা **লোটন মস্‌জিদ** দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর একটি গুম্বজ আছে। ইহার ইষ্টকে সবুজ, হল্‌দে, নীল ও সাদা মীনার কাজ অতি সুন্দর। ঐতিহাসিকদিগের মতে

এই মস্‌জিদটি ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান শমস্-উদ্দীন ইউসুফ্ শাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ লোটন নাচওয়ালী ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। মস্‌জিদ হইলেও ঐশ্বর্য্যে ইহা যে ধনীর বিলাস ভবন হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। ঐতিহাসিক গ্রেট্ বলিয়াছেন যে সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে তিনি এরূপ সুন্দর হাল্‌কা গাঁথুনির কারুকার্য্য খচিত সৌধ দেখেন নাই।

লোটন মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব্বে কিছু দূরে এবং চামকাঠি মসজিদের এক মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে, উহার নাম **ছোট সাগরদীঘি**। উহা পিয়াসবাড়ী দীঘির প্রায় চতুর্গুণ বড় হইবে। ইহা হইতে পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদের জল সরবরাহ হইত বলিয়া কথিত। ইহার তীরে কয়েক ঘর কৃষকের বসবাস আছে। কিংবদন্তী, ইহা হিন্দু রাজত্বকালে খনিত হইয়াছিল এবং ধনপতি ও চাঁদ সদাগর ইহার তটে বাস করিতেন।

লোটন মস্‌জিদ হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া দুই মাইল দক্ষিণে যাইয়া পাঁচ খিলানের একটি পুরাতন সাঁকো পার হইয়া রাজধানীর দক্ষিণ প্রাকার ভেদ করিয়া **কোতোয়ালী দরওয়াজা** অবস্থিত। ইহার এক্ষণে ভগ্নদশা। দ্বারের উভয় পার্শ্বে সহর কোতোয়াল ও প্রহরীগণের বাস করিবার অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রকোষ্ঠগুলি দ্বারের সহিত ধ্বংসমুখে পতিত। এই দরওয়াজার খিলান ৫১ ফুট চওড়া এবং ভূমি হইতে ১৭ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চ।

কোতোয়ালী দরওয়াজা শমস্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের বংশের সুলতান নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। নিকটস্থ সাঁকোটিও তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

কোতোয়ালী দরওয়াজা ছাড়াইয়া কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হইলে যেখানে ১২ নং মাইল-স্টোন পাওয়া যায়, সেই স্থানে **বল্লদীঘি** দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বল্লাল-সেনের সময় খনিত বলিয়া কথিত। ইহার অপর নাম 'বালুয়া' দীঘি।

বল্লদীঘি হইতে দুই মাইল দক্ষিণে গৌড়ের পুরাতন শহরতলী ফিরোজপুরে ফকির নিয়ামৎ উল্লার মস্‌জিদ আছে। এই স্থানে বহু মুসলমান যাত্রী আসিয়া থাকেন।

নিয়ামৎউল্লা গুজরাট হইতে আসিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন এখানে গুজরাটি পীরের মেলা বসে। সমাধিসৌধটি বাংলার আফগান রাজা সুলেমান কররানির রাজত্বকালে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিয়ামৎউল্লার সমাধির নিকটেই টাঁকশালদীঘির ধারে **ছোট সোণা মস্‌জিদ** অবস্থিত ইহার সম্মুখভাগের প্রস্তরে উৎকীর্ণ কারুকার্য্য অতি সুন্দর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এই মস্‌জিদকে র‍্যাভেন্‌শ "গৌড়ের মণি" বলিয়াছেন।

ইহা বড় সোণা মস্‌জিদের মত বারান্দাওয়ালা মস্‌জিদ। এমন সুন্দর পাথরের নক্সা গৌড়ের অন্য কোন মস্‌জিদে নাই। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত।

গৌড়ে আরও কয়টি দেখিবার স্থান আছে। তন্মধ্যে **কাঁচাগড়, লোহাগড়, চন্দ্র সূর্য্যের প্রস্তর, গৌড়েশ্বরীর মন্দির, জহরাবাসিনী, মনস্কামনা শিব, রমাভিটা, পাতালচণ্ডী,** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জাতির অতীত জীবনস্মৃতি গৌড়ের প্রতি ধূলিকণায়, অণুপরমাণুতে, আকাশে বাতাসে মিশাইয়া আছে। কালের প্রভাবে বাঙালীর গৌড়—লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত, বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কিন্তু তাহা হইলেও সেই ধ্বংসস্তূপের প্রত্যেক প্রস্তর, প্রত্যেক দেউল, প্রত্যেক মন্দির ও মস্‌জিদ বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নিকট পবিত্র। আজ মহামারীর প্রকোপে গৌড় মনুষ্য-বাসের অযোগ্য অরণ্যে পরিণত, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেনঃ

"যেথা মন্ত্রীসাথ নরনাথ বসিতেন ধীর
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।"

কিন্তু তাহা হইলেও সেই অরণ্য বাঙালীর নিকট পুণ্য তপোবন—পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর কত শত বাঙালী এই তীর্থ দর্শন করিতে যান, দর্শনান্তর অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন।

নিমাসরাই—কলিকাতা হইতে ২১০ মাইল দূর। ইহাই পুরাতন মালদহ। পুরাতন মালদহ রাজধানী পাণ্ডুয়ার বন্দর ছিল এবং মহানন্দা ও কালিন্দীর সঙ্গমের উপর মহানন্দার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। নূতন মালদহ বা ইংরেজ বাজার হইতে জলপথে কিংবা নদী পার হইয়া একটি পাকা রাস্তা ধরিয়া নিমাসরাই বা পুরাতন মালদহে আসা যায়।

পুরাতন মালদহ পূর্ব্বে রেশম বা সুতীর কাপড়ের বিখ্যাত গঞ্জ বা আড়ং ছিল এবং এখানে সর্ব্বপ্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরেজ ও ফরাসী ঈস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি কুঠি ইংরেজ বাজারে লইয়া যান। পূর্ব্বে নগরটির চারিদিকে প্রাকার ছিল এবং এখনও পারঘাটায় এই দুর্গের দুয়ার আছে। এই দরওয়াজার সম্মুখে মহানন্দার অপর পারে নদীতীরে ৫৫ ফুট উচ্চ একটি মিনার আছে। ইহা নিমাসরাই মিনার নামে পরিচিত। মিনারের গায়ে অনেক প্রস্তরখণ্ড বাহির হইয়া আছে এবং ইহা দেখিতে আগ্রার নিকটস্থ ফতেপুর শিক্‌রি নগরে আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হিরণ মিনারের মত। শিকারের জন্য কিংবা রক্ষীদের শত্রু আগমন লক্ষ্য করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবাদ, দূরে শত্রু আসিতেছে দেখিতে পাইলে মিনার গাত্রের প্রস্তরখণ্ডগুলির উপরে মশাল জ্বালিয়া দিয়া গৌড় নগরের লোককে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত পুরাতন মালদহে কয়েকটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে, তাহাদের মধ্যে ছোট সোনা মস্‌জিদই প্রধান; ইহা বাঙলার আফ্‌গান বা পাঠান রাজা দাউদ শাহ্‌ কররানির রাজ্যকালে মুসলমান বণিক মাশুম্‌ কর্ত্তৃক ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুইটি বৃহৎ গম্বুজ ও একটি খিলান বিশিষ্ট এই মসজিদটি দেখিতে সুন্দর। চারিকোণে চারিটি মিনার ও প্রবেশদ্বারে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভ আছে। মাশুমের ভ্রাতা পুরাতন মালদহের কাট্‌রা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। একটি প্রকাণ্ড উঠানের চারিদিকে বাড়ী তৈয়ারী করিয়াতাহার দুই দিকে দুইটি বড় দরওয়াজা রাখা হইত। ব্যবসায়ীরা

মাল পত্র লইয়া দ্বিতলে বা ত্রিতলের ঘরে থাকিতেন এবং একতলে দোকান হইত। ইহা ছাড়া ফৌতি মসজিদ বা ফুটী মস্‌জিদ এবং ফকীর শাহ্ গদার দরগাহে ফকিরের এবং একটি তোতা পাখীর কবর আছে; এই পাখীটি নমাজ আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিল। এই দরগাহের বিপরীত দিকে দুধ পীরের কবর; কবরের নিকট একটি গর্ত্তে দুধ ঢালিয়া লোকে পূজা দিয়া থাকে।

পুরাতন মালদহের পূর্ব্ব প্রান্তে 'ধর্ম্মকুণ্ড' ও 'দেবকুণ্ড' নামক দুইটি জলাশয় পাল রাজগণের সময়ে খনিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দেবকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে বেহুলা নদী নামে একটি ক্ষুদ্র জলধারা প্রবাহিত। প্রবাদ, বেহুলা লখিন্দরের মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে কালিন্দী নদী দিয়া এই নদীতে উপনীত হইয়াছিলেন। এই হেতু উহার নাম বেহুলা; ইহা নিমাসরাই স্টেশনের পূর্ব্ব দিকে নিকটেই অবস্থিত।

আদিনা—কলিকাতা হইতে ২১৪ মাইল। এই স্থানে নামিয়া মুসলমান যুগের বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজধানী পাণ্ডুয়ায় যাইতে হয়। স্টেশন হইতে সুবিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদ প্রায় তিন মাইল দূর। ইংরেজ বাজার হইতে সরাসরি মোটরগাড়ী করিয়া নদী পার হইয়া, পুরাতন মালদহ হইয়া আদিনায় যাওয়া যায়। পুরাতন মালদহ হইতে দূরত্ব মাত্র ৬ মাইল। আদিনা স্টেশনে নামিয়া পদব্রজে বা গোরুরগাড়ীতে পাণ্ডুয়া দেখিয়া আসাই সুবিধা। পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিতে পারিলে গোযান পাইতে কোনও অসুবিধা হয় না।

পাণ্ডুয়া—পাণ্ডুয়ার উত্তর সীমানা রায়দীঘি, পূর্ব্ব সীমানা আদিনা মসজিদ ও তাহার এক মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থান, পশ্চিম সীমানা মহানন্দা নদী এবং দক্ষিণ সীমানা শমসাবাদ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোল মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আট মাইল। ইহা 'হজরৎ পাণ্ডুয়া' নামেও অভিহিত হয়। গৌড় প্রসঙ্গে পাণ্ডুয়ার ও তাহার রাজাদের কথা বলা হইয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে ইহাই প্রাচীন কালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। (বগুড়া স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

পুরাতন মালদহ হইতে দিনাজপুরের রাস্তা ধরিয়া ছয় মাইল চলিলে যেখানে রেলপথে আদিনা রেল স্টেশন অবস্থিত, ঐ স্থান হইতে বন জঙ্গল পওয়া যায়। এই স্থান হইতে ধ্বংসাবশিষ্ট পাণ্ডুয়া নগরের প্রান্ত প্রায় দুই মাইল দূর। প্রথমে পড়িবে পাণ্ডুয়ার 'বড় দরগাহ্'। এই দরগাহে পীর সৈয়দ মখদুম শাহ্ জলাল তব্‌রিজীর সমাধি আছে। দরগাহে মুসলমান ফকিরদিগকে নিত্য ও আহার্য্য পানীয় দানে সেবা করা হয়। এজন্য সম্পত্তির আয় নির্দ্দিষ্ট আছে। ২২ হাজার বিঘা পীরোত্তর লইয়া এই সম্পত্তি বলিয়া দরগাহটি সাধারণতঃ বাইশ হাজারী দরগাহ নামে পরিচিত। পুরীধামে যেমন শ্রীচৈতন্যের দন্তকাষ্ঠ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, এই দরগার প্রাঙ্গনেও তেমনই একটি নিম্ব বৃক্ষ দেখাইয়া বলা হয় যে, ফকির সাহেবের দন্তকাষ্ঠ হইতে উহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাভেন্‌শ বলেন, ফকিরের দাক্ষিণাত্যে দেহান্তর হইয়াছিল এবং সেইস্থানে তাঁহার প্রকৃত কবর আছে, এইটি তাহার নকল। দরগাহের মধ্যস্থ জুম্মা মস্‌জিদ সুলতান আলি মুবারক ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মস্‌জিদের মধ্যে যেখানে ফকির জলাল তবরিজী বসিয়া উপাসনা করিতেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা উহার চারিদিক রৌপ্যনির্ম্মিত বেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া দিয়াছিলেন। এখন আর সেই বেষ্টনী দেখিতে পাওয়া যায় না। রজবের ১লা হইতে ২২শে পর্য্যন্ত এই দরগাহে মুসলমান ফকির ও মোল্লাগণ সমবেত হইয়া থাকেন। তদুপলক্ষে ভোজ ও উৎসব হয়। ঐ সময়ে এবং সাবান মাসে এই স্থানে মেলা বসে। এই দুই মেলা উপলক্ষে ভারতের প্রায় সর্ব্ব স্থান হইতে ফকিরগণ আসিয়া থাকেন।

এই দরগাহে পাঁচটি খিলান আছে। বাহিরের চত্বরে ২টি কষ্টি প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। চত্বরের একপার্শ্বে একটি দাড়িম্ব বৃক্ষ আছে; বন্ধ্যা নারীরা পুত্র কামনায় ইহাতে ইষ্টকখণ্ড বাঁধিয়া দিয়া থাকে। বড় দরগাহের পূর্ব্ব পার্শ্বে হিন্দু মন্দিরের আকারে একটি ছোট মস্‌জিদ আছে। উহা পূর্ব্বে মন্দির ছিল; কষ্টি প্রস্তরের উপর নক্সা দেখিয়াও মনে হয় ঐ গুলি হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের।

এই দরগাহ মধ্যে লক্ষ্মণসেনী দালান নামে একটি পুরাতন সৌধের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; এই নাম কিরূপে হইল জানা যায় নাই।

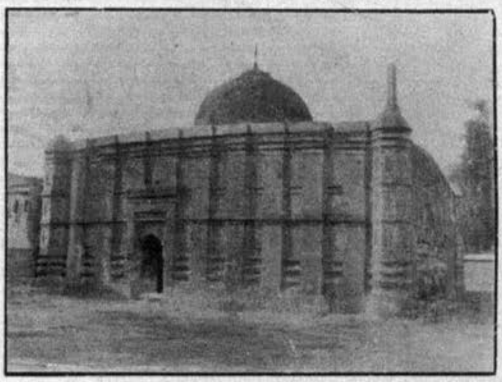
দরগাহে পুঁথি মুবারক নামে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পীর জলাল তবরিজী সাহেবের জীবনী সম্বলিত একখানি পুস্তক রক্ষিত আছে।

বড় দরগাহের প্রধান প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে পূর্ব্বমুখী **ছোট দরগাহ্‌** অবস্থিত। এক কালে এই দরগাহের ছয় হাজার বিঘা পীরোত্তর সম্পত্তি ছিল বলিয়া ইহা ছয় হাজারী দরগাহ্‌ নামেও পরিচিত। ইহার মধ্যে বিখ্যাত সাধক নূর কুতব-উল-আলম্‌ ও আলা-উল-হকের সমাধিস্থান আছে। আলা-উল হক গৌড় সাদুল্লাপুরের পীর শেখ্‌ অখি সিরাজ-উদ্দীন সাহেবের শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ সাধক হজরৎ নূর-কুতব্‌-উল-আলম্‌ রাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতান শমস্‌-উদ্দীন ইসুফ শাহ কর্ত্তৃক দরগাহ্‌টি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত। এই কবরের পশ্চিমদিকে একতল প্রাচীন গৃহটিকে "চিল্লিখানা" বলে। এই গৃহে কুতব আলম উপাসনা করিতেন। এই দরগাহের প্রাঙ্গনে ভগ্নাবশিষ্ট 'কাজী নূর মস্‌জিদ' দেখিতে পাওয়া যায়। দরগাহর উত্তরদিকে প্রাচীরের বাহিরে ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ খনন করিয়া বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত চতুষ্কোণ কষ্টি প্রস্তরের স্তম্ভ এবং উজ্জল প্রস্তরখণ্ডসমূহ পাওয়া গিয়াছে। আরও কয়টি বৃত্তাকার কৃষ্ণপ্রস্তরাসনও ঐ সঙ্গে ঐ স্থান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই পতিত ভূখণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে **'মুরিদখানা'** নামক একটি জীর্ণ ইমারত আছে। কথিত আছে, ঐ স্থানে মুসলমান আমলে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। রাজা গণেশের পুত্র যদুও নাকি ঐ স্থানে মুসলমান হইয়া সুলতান জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ছোট দরগাহের তিনটি গুম্বজ আছে, একটি ভগ্ন। সম্মুখে প্রস্তর প্রাচীর-বেষ্টিত পুষ্করিণী আছে। প্রাঙ্গণে বিস্তর কবর দেখা যায়। বহু প্রস্তরের উপর হিন্দু দেবদেবী

অঙ্কিত আছে। এই দরগাহেও ভারতের নানা স্থান হইতে ফকির দরবেশ আসিয়া থাকেন।

ছোট দরগাহ্ হইতে কিছু উত্তরে সোনা মস্জিদ অবস্থিত। ইহার অপর নাম **কুতবসাহী মস্জিদ**। এই মস্জিদটি মুরিদখানার উত্তরদিকে অবস্থিত। ইহারও এখন ভগ্নদশা। পূর্ব্বে ইহার দশটি গুম্বজ ছিল, এখন একটিও নাই। তবে ভগ্ন জীর্ণ দ্বার, স্তম্ভ, মিম্বর এখনও এই স্থানে দেখা যায়। কষ্টি প্রস্তরের একটি স্মৃতিফলকে লিখিত আছে যে, এই মস্জিদ মুখদুম উবেদ কাজি ৯৯০ হিজিরায় (১৫৮৪ খৃঃ) ইহা নির্ম্মাণ করান।

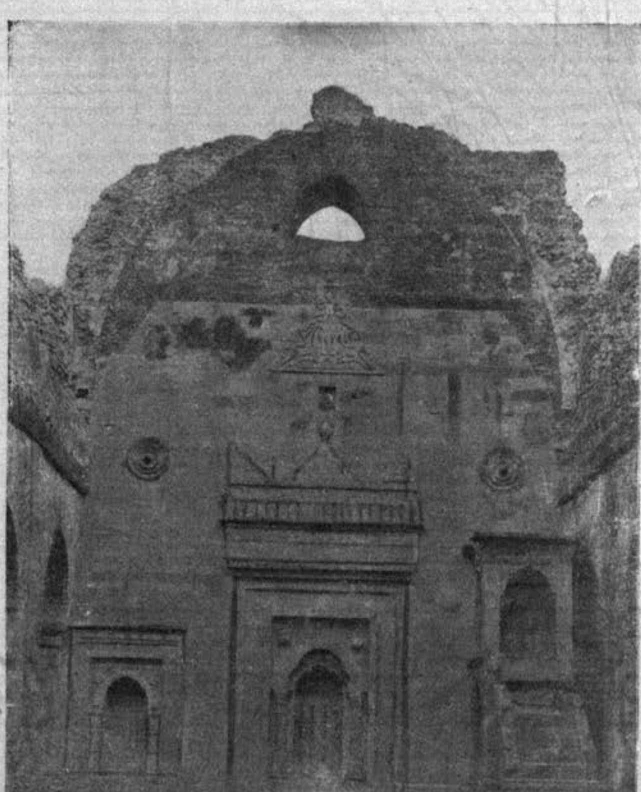


একলাখী, পাণ্ডুয়া

এই মস্জিদের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে **একলাখী** নামক সুবৃহৎ সমাধি সৌধ অবস্থিত। ইহার উপর একটি প্রকাণ্ড গুম্বজ আছে। ইহার দক্ষিণ দিকস্থ কষ্টি পাথরের প্রধান প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বস্থ প্রস্তরে হিন্দু মূর্ত্তি খোদিত আছে; পরন্তু দ্বারের পাষাণ চৌকাঠে বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে। তাহাতে মনে হয়, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে তোরণটি সংগৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন একলাখীর বহু প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্ট হয়। প্রস্তরের দেওয়ালে লতা পাতা পুষ্পাদি খোদিত। ইহার ইষ্টকের গাঁথুনি অতি চমৎকার, তদুপরি নক্সার কাজ আরও সুন্দর, ঠিক গৌড়ের চিকা মসজিদের মত। প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারশীর্ষে গণেশ মূর্ত্তি পাষাণে খোদিত। পূর্ব্বে চারটি মিনার ছিল, এখন ঐগুলি ধ্বংসমুখে পতিত। এই সৌধে রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জলাল-উদ্দীনের, তাঁহার পত্নীর ও পুত্র সুলতান শমস্-উদ্দীন আহম্মদ শাহের সমাধি আছে। একলাখী বাংলার পাঠান সুলতানদের স্থপতি-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তখনকার কালের লক্ষ টাকা বড় সামান্য নহে। বোধ হয় এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'একলাখী' হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ ইহাকে "একলক্ষী" মসজিদ নামে

অভিহিত করেন, এবং অনেকেই বলিয়া থাকেন তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন যে ইহা পূর্ব্বে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। অনুমান ১৪১৪ হইতে ১৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রায় ১৫ ফুট চওড়া প্রাচীনকালের যে পথ দিয়া পাণ্ডুয়া ও আদিনা যাওয়া যায় উহার উপরটা কাঁচা বটে, কিন্তু তলদেশ ইট দিয়া প্রস্তুত। এই পথের উভয় পার্শ্বে জঙ্গলাবৃত স্থানে ভগ্ন ইষ্টকস্তূপসমূহ দেখা যায়। মুসলমান রাজত্বকালে পথের উভয়



আদিনা মস্‌জিদের ভাস্কর্য্য

পার্শ্বে যে হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইত ইহা তাহারই নিদর্শন। এই পথে একলাখী হইতে এক মাইল উত্তরে পুরাতন কালের একটি সেতুর স্তম্ভে গণেশ প্রভৃতি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন গৌড় হইতে প্রস্তরাদি উপাদান আনিয়া পণ্ডুয়া নগরী নির্ম্মিত ও শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ এইরূপে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত সেতু হইতে দুই মাইল উত্তরে বিশাল **আদিনা মস্‌জিদ** অবস্থিত। ইহার তিন দিকের ছাদ ও গুম্বজ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিকের ধ্বংসাবশেষ এখনও সগর্ব্বে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা হুগলীর ইমামবাড়া ও মুর্শিদাবাদের কাটরা মস্‌জিদ অপেক্ষাও বড়। মস্‌জিদটি ৫০০ ফুট লম্বা ও ৩০০ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুট উচ্চ। এরূপ বিশাল মস্‌জিদ ভারতের অন্য কোথাও আর নির্ম্মিত হয় নাই এবং পৃথিবীতেও খুব অল্পই আছে। ফার্‌গুসানের মতে দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ ও বিরাট জুম্মা মস্‌জিদের মাপে ও অবিকল অনুকরণে এই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বাংলার মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মস্‌জিদের মধ্যে একটি কষ্টি প্রস্তর-মণ্ডিত বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে আচার্য্য উপাসনা করিতেন। উপাসনার বেদীটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, দেখিতে ঠিক হিন্দু মন্দির বা রথের মত। ইহা যে পূর্ব্বে হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি সুবৃহৎ ব্যারাকের ন্যায় কক্ষের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়—ঐ স্থানে সহস্রাধিক লোক একত্র নমাজ করিতে পারিত।

মস্‌জিদের কয়েকটি ধ্বংসাবশিষ্ট কক্ষের প্রবেশদ্বারের কষ্টি প্রস্তরের চৌকাটে লতা পুষ্প সর্পাদি চিত্রাঙ্কিত সুন্দর কারুকার্য্য এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এগুলিও পূর্ব্বে হিন্দু মন্দিরের অঙ্গ ছিল।

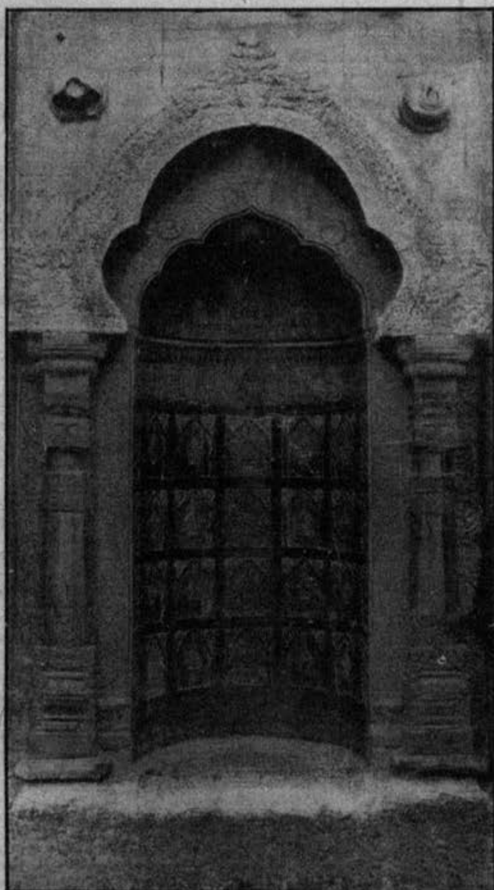
মস্‌জিদের অভ্যন্তর পাথরের থাম ও ইটের দেওয়াল দিয়া ১২৭টি সমভুজে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকের উপর একটি করিয়া গুম্বজ ছিল।

মস্‌জিদের মধ্যে উপাসনা প্রকোষ্ঠ আংশিক দ্বিতল এবং ইহাতে বাদশাহের (অর্থাৎ বাংলার সুলতানের) বসিবার স্থান ছিল; বাদশাহ ঐ স্থানে গুপ্ত পথ দিয়া আসিতেন। ঐ স্থানের নাম বাদশাহকী তখৎ। কেহ কেহ বলেন এখানে বেগমেরা নমাজ পড়িতেন। আহমেদাবাদের মস্‌জিদগুলিতে এইরূপ তখৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্‌জিদের অধিকাংশ স্তম্ভ, মিনার গুম্বজাদি পড়িয়া গিয়াছে, তবুও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিবার জিনিষ। কোন কোন গোলাকার প্রস্তরস্তম্ভ এত মসৃণ যে উহার মধ্যে দর্পণের ন্যায় মুখ দেখা যায়। কোন কোন কক্ষপ্রাচীর কষ্টিপ্রস্তর দ্বারা উর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত মণ্ডিত। কক্ষপ্রাচীর গাত্রে তোগরা অক্ষরে কোরাণের বয়েত লিখিত আছে,—মর্ত্ত্যবাসি! তোমরা মাথা নামাইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আল্লাহর উপাসনা কর।

স্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে শুনা যায়, পূর্ব্বে এখানে "আদিনাথ" নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং "আদিনা" নামটি "আদিনাথ" নামেরই অপভ্রংশ। এই কিংবদন্তীর বলে কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় সাঁওতালগণ এই মস্‌জিদ অধিকার করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। উপাসনার বেদীর উপর উঠিবার সোপানে ছয়টি ধাপ আছে, উহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ধাপের গাত্রে একটি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ গ্রথিত আছে। ঐটি কোনও হিন্দু দেবমূর্ত্তি হইবে। মসজিদের গাত্রের প্রস্তরগুলিতেও কোথাও কোথাও হিন্দুর গণেশাদি দেবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে দেখিতে

পাওয়া যায় এবং এখান হইতে বহু পাষাণনির্ম্মিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। এই হেতু হ্যাভেল প্রমুখ স্থপতি শিল্পীরা অনুমান করেন যে, এই আদিনা মস্‌জিদ এবং পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের অন্যান্য অনেক প্রাসাদ ও মস্‌জিদ পূর্ব্বতন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে। আদিনা মস্‌জিদের খিলান ও বেদীর চারিপাশের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। কঠিন কষ্টি পাথর কাটিয়া

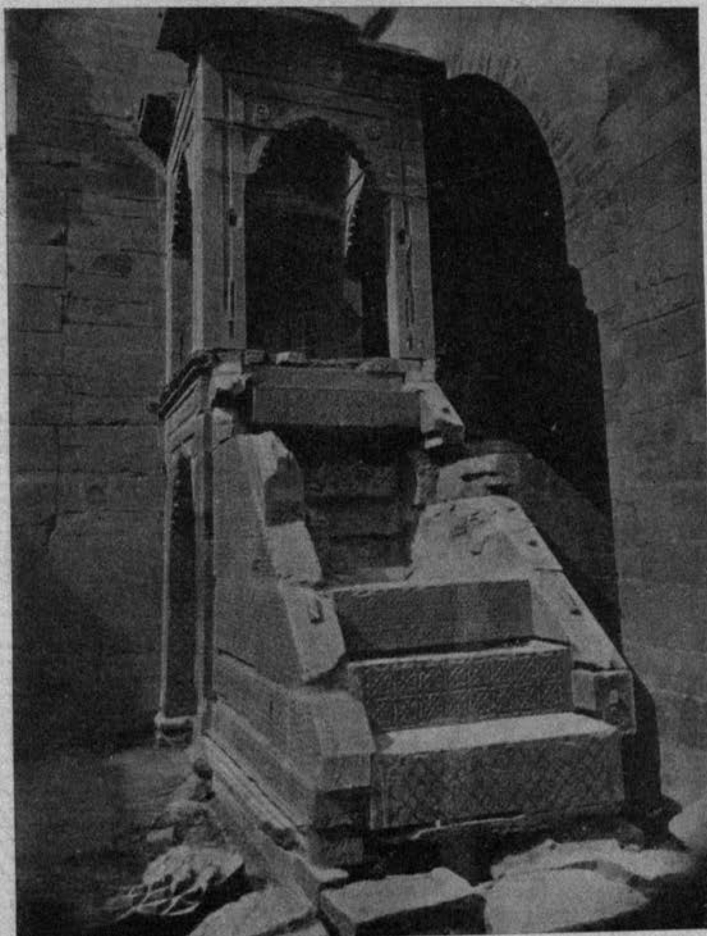


আদিনা মস্‌জিদের মধ্যস্থ কারুকার্য্য

যে ভাবে নক্সা করা হইয়াছে সেরূপ সুন্দর কারুকার্য্য দিল্লীতেও নাই। ছয়শত বৎসর-ব্যাপী মুসলমান শাসনের যুগে ভারতের যে সমস্ত প্রস্তর শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কেবল বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম্ আদিল শাহের কবরের শিল্পের আদিনা মসজিদের কারুকার্য্যের সহিত তুলনা হইতে পারে। সুলতান শম্‌স্ উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্ ৭৭০ হিজিরায় (অর্থাৎ ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) এই বিখ্যাত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র গিয়াস-উদ্দীন আজম্ শাহের রাজত্ব-

কালে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষ হয়। বাদশাহ্ কী তখ্তের পশ্চাতে মস্জিদের ঠিক বাহিরে ও পশ্চিম দিকে স্থাপয়িতা সুলতান সিকন্দর শাহের প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি বর্ত্তমান।

মস্জিদ হইলেও ইহার অভ্যন্তরস্থ বাদশাহের বসিবার তখ্ৎ ও সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গন দেখিয়া ইহাকে দরবার-আম বলিয়া মনে হয়।



আদিনা মস্জিদের বেদী

আদিনা মস্জিদটি গভর্ণ্মেণ্ট্ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত করা হইয়াছে। ইহার প্রাঙ্গন ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।

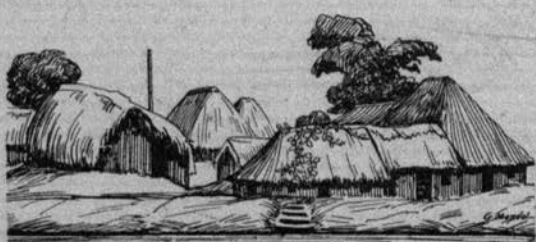
আদিনা মস্জিদের নিকট ডাক্-বাংলাটি সুন্দর। ঐ স্থানে বিশ্রাম লইয়া মস্জিদ দর্শন করা বিধেয়।

আদিনা মস্‌জিদের পূর্ব্ব দিকের দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাচীরের বাহিরে বিস্তীর্ণ বনাকীর্ণ ভূখণ্ড দেখা যায়। ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক মাইল পথ পূর্ব্বমুখে অতিক্রম করিলে **সাতাইশ-ঘর** নামক একটি ভগ্ন স্নানাগার দেখিতে পাওয়া যায়। উহা নৃপতি সিকন্দর শাহের প্রাসাদের অংশ বলিয়া কথিত। ইহার সম্মুখে একটি দুই শত হস্ত দীর্ঘ জলাশয় আছে। লোকে বলে উহা রাজা গণেশের সময়ে খনিত হইয়াছিল।

শামশী—কলিকাতা হইতে ২২৯ মাইল। স্টেশনে পৌছিবার কিছু আগেই মহানন্দা নদীর উপর একটি রেলওয়ে সেতু আছে। স্টেশন হইতে ৮ মাইল উত্তরে চাঁচল গ্রামে একঘর বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের বাস আছে; মালদহ জেলার উত্তরাংশে চাঁচল জমিদারী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। চাঁচলে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ডাকঘর, তারঘর প্রভৃতি আছে।

ভালুকা রোড্—কলিকাতা হইতে ২৩৫ মাইল। স্টেশনের পশ্চিম হইতেই মালদহ জেলার দিয়ারা অঞ্চল; বর্ষাকালে ইহা জলমগ্ন হইয়া যায়, মাঝে মাঝে উচ্চ ভূমিতে লোকের বাস। স্টেশন হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভালুকা গ্রামে এক ঘর জমিদারের বাস আছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর—কলিকাতা হইতে ২৪১ মাইল। এখানেও একঘর জমিদার আছেন। ইহার পরের স্টেশন কুমেদপুরের কিছু পর হইতে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার আরম্ভ। কুমেদপুরের দু স্টেশন পরে কাটিহার জংশন।



বাংলায় ভ্রমণ

প্রথম খণ্ড

—স্থান-সূচী—

দ্রষ্টব্যঃ—এই পুস্তকের যে পৃষ্ঠায় কোন স্থান সম্বন্ধে বিশিষ্ট উল্লেখ আছে, অথবা যে পৃষ্ঠা হইতে এইরূপ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে নিম্নলিখিত সূচীতে কেবলমাত্র তাহাই উদ্ধৃত হইল। কোন একটি স্থানের পার্শ্বে একাধিক পত্রাঙ্কের উল্লেখ থাকিলে উহা একই নামের বিভিন্ন স্থান বুঝিতে হইবে।

EB—740—10,000—4-5-40—EIR.

Published by L. P. Misra, General Manager, Eastern Bengal Railway.
Printed by H. Stanhope, East Indian Railway Press. Calcutta.

2206

·01'